পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬১ বর্ষ ॥ ২০তম সংখ্যা

৩০ শাহাদত ১৩৭৮ হিঃ শাঃ ❑ ৩০ এপ্রিল, ১৯৯৯ ঈসাব্দ

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

আপনার সন্ধানে আছি!

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

১. আপনি কি পরিশ্রম করতে জানেন? এইরূপ পরিশ্রম যে, তের-চৌদ্দ ঘণ্টা পর্যন্ত প্রত্যহ কাজ করতে পারেন?

২. আপনি কি সত্য কথা বলতে জানেন; এইরূপ সত্য কথা যে কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলেন না; এমন কি আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং প্রিয়জনও আপনার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলতে সাহস করে না এবং কেউ আপনার সম্মুখে নিজের মিথ্যা বীরত্বমূলক কেচ্ছা শুনালে আপনি তার প্রতি নিন্দা প্রকাশ না করে থাকতে পারেন না?

৩. আপনি কি মিথ্যা সম্মানের লালসা হতে মুক্ত? মহল্লার গলি ঝাড়ু দিতে পারেন? বোঝা বহন করে ঘুরে বেড়াতে পারেন? বাজারে উচ্চস্বরে সর্বপ্রকার ঘোষণা করতে পারেন? সমস্ত দিন চলতে এবং সমস্ত রাত জাগ্রত থাকতে পারেন?

৪. আপনি ই'তেকাফ করতে পারেন? এইরূপ ই'তেকাফ যে–
ক) এক স্থানে ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন থাকতে পারেন;
খ) ঘন্টার পর ঘন্টা বসে তসবীহ করতে পারেন এবং
গ) ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন কোন মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ ছাড়াই থাকতে পারেন।

৫. আপনি কি শত্রু ও বিরুদ্ধাচারীগণ পরিবেষ্টিত অজানা ও অচেনাগণের মধ্যে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস স্বীয় বোঝা বহন করে একা কপর্দকহীনভাবে সফর করতে পারেন?

৬. কোন কোন ব্যক্তি সকল পরাজয়ের উর্ধ্বে থাকে, তারা পরাজয়ের নামও শুনতে পসন্দ করে না। তারা পাহাড়-পর্বত কাটতে তৎপর হয় এবং নদীগুলোকে টেনে আনতে উদ্যত হয়ে পড়ে। আপনি কি এ রকম কাজ করতে সদা প্রস্তুত?

৭. আপনার এইরূপ মনোবল আছে কি যে, সমস্ত জগৎ বলবে ভুল– আর আপনি বলবেন শুদ্ধ। চারদিক হতে লোকেরা ঠাট্টা করবে কিন্তু আপনি গাম্ভীর্য বজায় রাখবেন। লোক আপনার পশ্চাদ্ধাবন করে বলবে : 'দাঁড়াও, আমরা তোমাকে প্রহার করবো'। তখন আপনার পদযুগল দ্রুত ধাবমান হওয়ার পরিবর্তে দাঁড়িয়ে পড়বে এবং আপনি মাথা পেতে বলবেন : 'এসো প্রহার কর'। আপনি তাদের কারো কথা মানবেন না। কেননা, তারা মিথ্যা বলে; কিন্তু আপনি সকলকে আপনার কথা স্বীকার করতে বাধ্য করবেন। কেননা, আপনি সত্যবাদী।

৮. আপনি এই কথা বলবেন না যে, আপনি পরিশ্রম করেছেন, কিন্তু খোদাতাআলা আপনাকে অকৃতকার্য করেছেন। বরং আপনি প্রত্যেক অকৃতকার্যতাকে নিজের দোষের ফলশ্রুতি বলে মনে করুন। আপনি ইহা বিশ্বাস করেন যে, যে পরিশ্রম করে সে-ই কৃতকার্য হয়। যে কৃতকার্য হয় নি, সে আদৌ পরিশ্রম করে নি।

আপনি যদি এইরূপ হয়ে থাকেন তাহলে আপনি একজন উত্তম মোবাল্লেগ এবং ভাল ব্যবসায়ী হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী। কিন্তু আপনি আছেন কোথায়? খোদার বান্দা অনেক দিন হতে আপনার অনুসন্ধান করছেন। হে আহমদী যুবক! সেই ব্যক্তির সন্ধান কর নিজ দেশে, নিজ নগরে, নিজ মহল্লায়, নিজ গৃহে, অনুসন্ধান কর নিজ অন্তরে। কেননা, ইসলামের বৃক্ষটি শুষ্ক হতে চলেছে, রক্ত সিঞ্চনে উহা পুনরায় সজীব হবে।

"প্রত্যেক ওয়াদা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে"

আল্লাহ্তাআলা প্রত্যেক নবী-রসূলের কাছ থেকে 'মিসাক' বা অঙ্গীকার নিয়েছেন। নবীরাও তদনুযায়ী প্রত্যেকে তাঁদের স্ব স্ব অনুসারীদের থেকে ওয়াদা ও অঙ্গীকার নিয়েছেন বয়াতের আকারে। বয়াতের শর্তাবলী পালনের মধ্যেই অনুসারীদের জীবনের সফলতা ও সার্থকতা।

আল্লাহ্তাআলা কুরআন করীমে বলেছেন–ইন্নাল আহদা কানা মাসউলা অর্থাৎ নিশ্চয় প্রত্যেক ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে। বর্তমান যুগে আমরাও যুগ-ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ আলায়হেস সালামের সাথে ১০টি শর্ত পালন করার ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতিতে তাঁর নিকট বয়াত হয়েছি। কেবল মাত্র মৌখিক বয়াতের কোন মূল্য নেই। বয়াতের শর্তানুযায়ী নিজেদের জীবনকে পরিচালিত না করলে আমরা সকলেই যে জিজ্ঞাসিত হবো সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) বার বার বয়াতের শর্তানুযায়ী চলার জন্যে তাঁর (আঃ) জামাতের লোকদের তাগিদ দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন :

"বয়াতের তাৎপর্য সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা উচিত এবং ইহার অনুগমন করা উচিত। বয়াতের তাৎপর্য ইহাই যে, বয়াতকারী তাহার মধ্যে সত্যিকারের পরিবর্তন এবং নিজ হৃদয়ে খোদা-ভীতি সৃষ্টি করিবে এবং প্রকৃত উদ্দেশ্য জানিয়া নিজের জীবনকে একটি পবিত্র নমুনা সৃষ্টি করিয়া দেখাইবে। যদি এইরূপ না হয় তবে বয়াতে কোন লাভ নেই; বরং এই বয়াত তাহার জন্য আরো আযাবের কারণ হইবে। কেননা, অঙ্গীকার করার পর জানিয়া বুঝিয়া ও স্বজ্ঞানে নাফরমানী করা ভয়ংকর বিপজ্জনক" *(মলফুযাত, দশম খন্ড, পৃঃ ৩৩৪)*।

আমাদের প্রত্যেকের আত্ম-বিশ্লেষণ করা দরকার আমরা কি আমাদের বয়াতের শর্তাবলীর মাপকাঠিতে যোগ্য বলে গণ্য হবো। আমরা সারা দিনের কর্মক্লান্ত দেহ যখন বিছানায় এলিয়ে দেই তখন কি আমরা ভেবে দেখেছি যে, আজ সারাদিন আমরা যে কাজগুলো সম্পাদন করেছি তা কি বয়াতের শর্তাবলীর কষ্টিপাথরে সঠিক বলে বিবেচিত হবে? আমরা কি ভেবে দেখেছি যে, আমাদের যত কর্মকান্ড 'ম্যায় দিন কো দুনিয়া পর মুকাদ্দম রাক্ষুঙ্গা' অর্থাৎ আমরা ধর্মকে দুনিয়ার ওপরে প্রাধান্য দেবো–প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যথার্থ হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে তাহলে এখনই আমাদের শুধরিয়ে নেয়া দরকার। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্বেই শুধরানোর প্রকৃষ্ট সময়। যখন মহামূল্যবান প্রাণ বায়ু ঝড়ের পাখীর ন্যায় নীড় ছাড়তে বাধ্য হবে তখন আর শুধরানোর সময় থাকবে না। সেই মহা যাত্রার পূর্বে আমাদের দেখে নেয়া দরকার, আমাদের গাটরী-বোচকাগুলো কী প্রয়োজনীয় জিনিষ দ্বারা পরিপূর্ণ নাকি এমন কতকগুলো বেহুদা জিনিস দ্বারা পরিপূর্ণ যা মহারাজাধিরাজের দরবারে প্রত্যাখ্যাত হবে। আমাদের যে কড়ায় গন্ডায় হিসাব মিলিয়ে দিতে হবে। ওয়াদাগুলো ঠিক ঠাকভাবে পালন করেছি কিনা সে জবাব দিতে হবে। সে দিন আসার পূর্বে আমরা যেন নিজেরাই একবার হিসাব মিলেয়ে নেই নচেৎ আল্লাহ্র দরবারে আমরা মুখ দেখাবো কোন সাহসে!

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

পাক্ষিক আহমদী

নব পর্যায় ৬১ বর্ষ ॥ ২০ তম সংখ্যা

১৭ বৈশাখ ১৪০৬ বঙ্গাব্দ ❑ ১৩ মুহাররম ১৪২০ হিঃ কাঃ
৩০ শাহাদত ১৩৭৮ হিঃ শাঃ ❑ ৩০ এপ্রিল ১৯৯৯ ঈসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ❑ অন্যান্য দেশে £ 50/ $ 100

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী

সম্পাদক
মকবুল আহমদ খান

সহকারী সম্পাদক
মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
ডাঃ মুহাম্মদ সেলিম খান

শিল্প নির্দেশক
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
সালাহ উদ্দীন আহমদ

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
মোহাম্মদ শামসুর রহমান

সহকারী হিসাব ব্যবস্থাপক
গিয়াসুদ্দীন আহমদ

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ, কে, রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মুহাম্মদ আব্দুল হাদী	-	লন্ডন, ইউ কে
ইসমত পাশা	-	কানাডা
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	-	নিউ ইয়র্ক
মইন উদ্দিন সিরাজী	-	ক্যালিফর্নিয়া
আজিজ আহমদ চৌধুরী	-	জার্মানী
কাউসার আহমদ	-	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম	-	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ	-	জাপান
মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম	-	হংকং
ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ	-	নিউজিল্যান্ড

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
ফোন ঃ ৯৬৬২৭০৩, ৫০৫২৭২ ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৬৩৪১৪

সম্পাদকীয়

জন্মভূমির প্রতি আশু কর্তব্য

প্রিয় জন্মভূমি মাতৃভূমির প্রতি প্রত্যেকেরই একটা নাড়ির টান থাকে—গভীর অরণ্য, সাগর বক্ষ:, উষর-মরু, পর্বত-কন্দর, শস্য-শ্যামল ভূমি—যেখানেই তার জন্ম হোক না কেন। প্রকৃতির সরস লীলা ক্ষেত্র বিচিত্র রূপ-রস-গন্ধে ভরা এই সোনার বাংলায় আমরা জন্মগ্রহণ করেছি। এর স্বচ্ছ নীল আকাশ, স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার কিরণ, মৃদুমন্দ সমীরণ, সবুজ-শ্যামল ধান ক্ষেত, অসংখ্য নদী-খাল-বিল, কোকিল ডাকা বসন্ত–এই বিচিত্র পরিবেশে লালিত-পালিত হয়ে আমরা বড় হয়েছি। আমরা এই সোনার দেশকে ভালবাসি, ভালবাসি এর প্রতিটি মানুষকে। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর কাছ থেকেই আমরা শিখেছি জন্মভূমিকে ভালবাসার কথা। তিনি বলেছেন, "হুব্বুল ওয়াতানে মিনাল ঈমান" অর্থাৎ জন্মভূমিকে ভালবাসা ঈমানের অঙ্গীভূত। তিনি (সঃ) তাঁর দেশকে কত ভালবাসতেন তা আমরা তাঁর হিজরতের সময়ের ঘটনা থেকে জানতে পারি।

দেশকে ভালবাসি বল্‌লেই কর্তব্য সম্পাদিত হয়ে যায় না। দেশকে ভালবাসতে হলে একদিকে যেমন সুনাগরিক হতে হয় তেমনি দেশের প্রয়োজনের সময় এর পাশে নিজের যা কিছু আছে তা নিয়ে দাঁড়াতে হয়। আজ আমাদের এই বাংলাদেশে সবচে' বড় যে অভাব তা হ'ল সুস্থ নৈতিকতার অভাব, মানুষকে ভালবাসার অভাব। নিচু তলা থেকে শুরু করে ওপর তলা পর্যন্ত সকল স্তরে সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে নৈতিক অবক্ষয়। এই অবক্ষয়ের প্লাবনে গোটা জাতি যেন আজ হাবুডুবু খাচ্ছে। এর প্রতিক্রিয়া আমরা দেখতে পাই প্রতিদিন সংবাদপত্রে চোখ বুলালেই। অবক্ষয়ের মাত্রা কতটা নিম্নমুখী হয়েছে তা বিশ্ব ব্যাঙ্কের ইদানিং কালের একটি রিপোর্ট থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবে। রিপোর্টে বলা হয় : ৯৭ সালের প্রথম ৬ মাসে ১৪০ জন মহিলা নিহত হয়। ৯৮ সালের প্রথম ৬ মাসে নিহত নারীর সংখ্যা ২৩১। ধর্ষণের সংখ্যা ৯৭ সালের প্রথম ৬ মাসে ৪৩ জন। ৯৮ সালের একই সময়ে ধর্ষণের সংখ্যা ৪৫৯ (ইনকিলাব, ১৯শে এপ্রিল, '৯৯)।

গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, এই অবক্ষয়ের মূলে রয়েছে খোদা-বিমুখতা। ন্যায়-নীতিকে পদদলিত করে মানুষ জন্তু-জানোয়ারের মত জীবন যাপন করতে শুরু করেছে। জড়বাদিতা জগদ্দল পাথরের মত এ সমাজের বুকে চেপে বসেছে। কেবল নিজের আরাম-আয়েশ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিয়েই সকলে ব্যস্ত—তা যে কোন মূল্যেই অর্জন করতে হবে। এতে সমাজের তথা দেশের ক্ষয়-ক্ষতির কোন পরওয়াই করা হয় না।

এহেন অবস্থার প্রেক্ষিতে ইলাহী জামাতের লোকদের দায়-দায়িত্ব অনেক বেশী। জন্মভূমির মানুষগুলোকে সোনার মানুষে পরিণত করতে না পারলে এ অবক্ষয়ের স্রোত যে সকলকেই ভাসিয়ে নিয়ে যাবে একথা জোর দিয়ে বলা যায়। নিজ গরজে তাদের কল্যাণের জন্যে আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে। আর এ কাজ সম্ভব হতে পারে দু'টি পদ্ধতিতে-প্রথমতঃ দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র কাজ অর্থাৎ মানুষকে খোদার দিকে আহ্বান করে, দ্বিতীয়তঃ তাদের জন্যে খোদার দরবারে আকুতি ভরে দোয়া করে। আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব (আইঃ) পূর্বাহ্নেই আমাদের দৃষ্টি এ দিকে আকর্ষণ করে বার বার তাগিদ দিচ্ছেন যেন আমরা প্রত্যেকে দায়ী ইলাল্লাহ্ হওয়ার জন্যে চেষ্টা করি। আমরা আমাদের ইমামের কথায় যত সক্রিয় হবো ততই আমরা আমাদের দেশবাসীকে অবক্ষয়ের পঙ্কিলতা থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হবো। তদুপরি বর্তমান সংকটের মুহূর্তেও দেশ আমাদের নিকট বিশেষ দোয়ার প্রত্যাশী। দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। তদুপরি নানা প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলেও দেশটি জর্জরিত। দেশ বাঁচলে দেশের লোক বাঁচবে। ইলাহী জামাতের সদস্য হিসেবে তাই আসুন আমরা আজ এক্ষুণি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হই এবং নিজ দায়িত্ব পালন করে জন্মভূমির সুসন্তানদের মত তার সেবা করে ধন্য হই।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃঃ
❑ কুরআন মজীদ ঃ	ঃ 'কুরআন মজীদ' থেকে	৩
❑ হাদীস শরীফ ঃ নিয়্যতের উপর কর্ম নির্ভরশীল	ঃ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা- মাওলানা সালেহ আহমদ	৪-৫
❑ অমৃত বাণী ঃ গুনাহ্ সে নাজাত কিঁউ কার মিল সাকতি হ্যায় হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)	ঃ অনুবাদ- জনাব মোহাম্মদ ফজলুল করীম মোল্লা	৫-৬
❑ ওয়াকফে নও সৈন্যদের দায়িত্ব	ঃ অনুবাদ- মাওলানা আব্দুল মতীন	৬
❑ জুমুআর খুতবা ঃ ইবাদতের প্রাণ তাকওয়ার মধ্যে নিহিত হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ- মাওলানা ইমদাদুর রহমান	৭-১৩
❑ তৌযীহে মরাম (লক্ষ্য-বস্তুর বিশ্লেষণ) ঃ মূল- হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ)	ঃ অনুবাদ- জনাব ওবায়দুর রহমান ভুঁইয়া	১৪
❑ জুমুআর খুতবা ঃ ইবাদতে ধৈর্যাবলম্বন হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ- মাওলানা বশীরুর রহমান	১৫-১৯
❑ উটেচড়া নবী চাঁদেচড়া মানুষ	ঃ জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	২০
❑ জুমুআর খুতবা ঃ ওয়াকফে নও শিশুদের তরবীয়ত হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ- জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	২১-২৬
❑ কাদিয়ান- দারুল আমান	ঃ অনুবাদ- জনাব নাজির আহমদ ভুঁইয়া	২৭-২৮
❑ ছোটদের পাতা ঃ আচ্ছি কাহানীয়াঁ- (ভাল ভাল গল্প) মূল : মিসেস বুশরা কুরায়েশী	ঃ পরিচালক- জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	২৯-৩১
❑ সংবাদ		৩২

প্রচ্ছদ : হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) ১৯৯৪ সনে কানাডার সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন

সন্তান লাভ

মহান আল্লাহ্তাআলা গত ২৩শে মার্চ, ১৯৯৯ আমাদের একটি পুত্রসন্তান দান করেছেন, আল্হামদুলিল্লাহ্।
উল্লেখ্য, মরহুম খোরশেদ আহমদ ভূঞা, ক্রোড়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এবং জনাব এস, এ নিজামী, নায়েবে আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চট্টগ্রাম নবজাতকের যথাক্রমে পিতামহ এবং মাতামহ। নবজাতকের সুস্থ ও কল্যাণময় জীবনের জন্য সকলের কাছে খাসভাবে দোয়ার আবেদন রাখছি।

তাযকির আহমদ ভূঞা ও মিসেস নিগার আহমদ
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চট্টগ্রাম।

দোয়ার আবেদন

আমাদের একজন প্রবীন মোয়াল্লেম হোসেন আহমদ সাহেব। তিনি দীর্ঘদিন থেকে জামাতের সেবা করে আসছেন। গত ১৯৮৭ সনে তিনি পুরুলিয়ায় মুখালিফাতের কারণে মারাত্মকভাবে বিরোধীগণ কর্তৃক আহত হন, এর পর থেকে তিনি পুরোপুরিভাবে স্বাস্থ্য ফিরে পান নি। বর্তমানে তিনি ডায়াবেটিস রোগে মারাত্মভাবে আক্রান্ত। ডাক্তার বলেছেন যে, তাঁর কিডনীর অবস্থাও ভাল নয়। জামাতের এ নিবেদিতপ্রাণ কর্মীর পূর্ণ ও শীঘ্র আরোগ্যের জন্যে জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট দোয়ার আবেদন করা হয়েছে।

- মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

কৃতী ছাত্র-ছাত্রী

আমাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র মাহমুদ আহমদ জুয়েল ১৯৯৮ সনের জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় দ্বিতীয় গ্রেডে বৃত্তি পেয়েছে। আমাদের কনিষ্ঠ পুত্র মঈনুল ইসলাম সোহেল প্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ্তাআলা তাদের ভবিষ্যৎ জীবন সব দিক থেকে যেন বরকতমণ্ডিত করেন সে উদ্দেশ্যে জামাতের সকলের নিকট দোয়ার অনুরোধ করছি।

মো: জালাল আহমদ ও
হাসিনারা বেগম হাসি, খাগদন জামাত

শোক সংবাদ

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলাস্থ বাসুদের গ্রামের আমার নানী জনাবা রশিদা খাতুন গত ১১/০৩/৯৯ ইং, বৃহস্পতিবার ভোর ৫টায় বার্ধক্যজনিত কারণে ৮৬ বছর বয়সে চট্টগ্রামে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহে .....রাজেউন)। তিনি মরহুম মৌলভী হায়দার আলী পন্ডিতের জ্যেষ্ঠা কন্যা এবং মরহুম ফয়জুল ইসলাম (হামদু) ভুঁইয়ার সহধর্মিণী। বিনয়ী, সত্যবাদী পরহেযগার এই মুখলিস আহমদী মৃত্যুকালে ৩ পুত্র, ৩ কন্যা, নাতি-নাতনী, অগণিত গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।
মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত ও আল্লাহ্তাআলা তাকে যেন জান্নাতুল ফেরদৌস দান করেন এজন্য জামাতের সকল ভ্রাতা-ভগ্নী ও শুভাকাঙ্খীদের নিকট খাসভাবে দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

- আফজালুর রহমান রিপন (সাংবাদিক)
ক্রোড়া জামাত

কুরআন মজীদ

সূরা মায়েদা-৫

১০৬। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমাদের রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা তোমাদের কর্তব্য। যখন তোমরা হেদায়াত-প্রাপ্ত হও৭৯৯ তখন যে পথভ্রষ্ট হইয়াছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। তোমাদের সকলকেই আল্লাহ্‌র দিকে ফিরিয়া যাইতে হইবে; তখন তিনি তোমাদিগকে তাহা অবহিত করিবেন যাহা তোমরা করিতে।

১০৭। হে যাহরা ঈমান আনিয়াছ! যখন তোমাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু কাল উপস্থিত হয়, তখন ওসীয়্যত করিবার সময় তোমাদের মধ্যে সাক্ষ্য-দানের ব্যবস্থা এই হইবে যে, তোমাদের মধ্য হইতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি সাক্ষী হইবে; অথবা তোমাদের ছাড়া অন্যদের মধ্য হইতে দুইজন হইবে, যদি তোমরা ভূপৃষ্ঠে সফর করিতে থাক এবং তোমাদের উপর মৃত্যুর বিপদ নামিয়া আসে।৮০০ তোমরা নামাযের পর উভয়কে (সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য) আটকাইবে,৮০১ যদি তোমরা (তাহাদের সাক্ষ্য সম্বন্ধে) সন্দিহান হও তাহা হইলে তাহারা আল্লাহ্‌র কসম খাইয়া বলিবে, 'আমরা ইহার বিনিময়ে কোন মূল্য গ্রহণ করিব না যদিও সে (যাহার সম্বন্ধে আমরা সাক্ষ্য দিতেছি আমাদের) নিকট আত্মীয়ই হউক না কেন; আমরা আল্লাহ্‌র (নির্দিষ্ট সত্য) সাক্ষ্য গোপন করিব না, করিলে নিশ্চয় আমরা পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

১০৮। কিন্তু যদি ইহা প্রকাশ পায় যে, তাহারা দুইজন (সাক্ষীদ্বয়) পাপের ভাগী হইয়াছে, তাহা হইলে উক্ত দুই জনের স্থলে অন্য দুই ব্যক্তি তাহাদের মধ্য হইতে দাঁড়াইবে যাহাদের বিরুদ্ধে পূর্ববর্তী দুই ৮০২ ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়াছিল এবং তাহারা আল্লাহ্‌র কসম খাইয়া বলিবে, 'নিশ্চয় আমাদের সাক্ষ্য (পূর্ববর্তী) ঐ সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্য হইতে অধিকরত সত্য এবং আমরা সীমালংঘন করি নাই; যদি আমরা ইহা করিয়া থাকি তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা যালেমদিগের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

১০৯। ইহা উত্তম পদ্ধতি, যদ্বারা তাহারা সঠিক রূপে সাক্ষ্য দিবে, অথবা এই কথার ভয় করিবে যে, তাহাদের কসমকে অন্য কসমের দ্বারা রদ্ করা হইবে। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং মনযোগ দিয়া শ্রবণ কর। কারণ আল্লাহ্ বিদ্রোহপরায়ণ জাতিকে হেদায়াত দান করেন না।'

রুকূ ১৪

১১০। (সেই দিনকে স্মরণ কর) যে দিন আল্লাহ্ রসূলগণকে একত্রিত করিবেন এবং বলিবেন, 'তোমাদিগকে কি জবাব দেওয়া হইয়াছিল?' তাহারা বলিবে, 'আমরা জানি না; নিশ্চয় তুমি অদৃশ্য বিষয়সমূহের সর্বজ্ঞাতা।'৮০৩

১১১। যখন আল্লাহ্ বলিবেন, 'হে মরিয়মের পুত্র ঈসা! তুমি তোমার উপর এবং তোমার মাতার উপর আমার নেয়ামতকে স্মরণ কর যখন আমি রূহুল কুদুস (পবিত্র আত্মা) দ্বারা তোমাকে সামর্থ্য দান করিয়াছিলাম, তুমি দোলনায় ও পৌঢ় বয়সে৮০৪ লোকদের সহিত কথা বলিতে, এবং যখন আমি তোমাকে কিতাব ও হিকমত এবং তওরাত ও ইন্‌জীল শিক্ষা দিয়াছিলাম, আর যখন তুমি আমার আদেশে কাদা হইতে পাখীর (অবস্থার) অনুরূপ সৃষ্টি করিতে, অতঃপর উহাতে (নব-জীবন) ফুৎকার করিতে তখন আমার আদেশে উহা উড্ডয়নশীল হইত, এবং আমার আদেশে তুমি অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করিতে৮০৫ এবং আমার আদেশে তুমি মৃতকে উত্থিত করিতে, এবং যখন আমি বনী ইস্‌রাঈলকে তোমা হইতে রুখিয়া রাখিয়াছিলাম,৮০৬ যখন তুমি তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহসহ আসিয়াছিলে। তখন তাহাদের মধ্যে যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছিল তাহারা বলিয়াছিল, 'ইহা প্রকাশ্য যাদু ব্যতীত কিছুই নহে।'

৭৯৯। আমাদের কর্তব্য হইল, অন্যান্যের কাছে সত্যের বাণী পৌছাইয়া দেওয়া। যদি তাহারা সত্যকে গ্রহণ করে, তাহা হইলেও উত্তম। যদি আমাদের পুর্ণ চেষ্টা সত্ত্বেও তাহারা তাহাদের মন্দ পথ হইতে ফিরিতে না চায়, তাহা হইলে তাহাদের সত্য-প্রত্যাখ্যান দ্বারা আমাদের কোনই ক্ষতি হইবে না। তাহাদিগকে আমাদের চিন্তাধারার মধ্যে শামিল করিবার প্রয়াসে, আমরা যেন নীতি বিসর্জন না দিই। ইহা হইবে আত্ম-হত্যার শামিল। অন্যের আত্মাকে বাঁচাইতে যাইয়া নিজের আত্মাকে হত্যা করা একটি অশুভ আচরণ।

৮০০। মহানবী (সঃ)-এর যমানায় একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহা অত্র আয়াত ও পরবর্তী দুইটি আয়াতের উপর আলোকসম্পাত করে। একজন মুসলমান নিজ ভূমি হইতে বহুদূরে মৃত্যু বরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই খৃষ্টান-ভ্রাতা, তামীমদারী ও আদীর কাছে, তাহার মাল-পত্র জমা রাখিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, ঐ জিনিষ পত্রগুলি যেন তাহারা মদীনায় অবস্থানরত তাহার উত্তরাধিকারগণের নিকট পৌছাইয়া দেয়। মালামাল গ্রহণ করার পর উত্তরাধিকারীরা দেখিল যে, একটি রৌপ্যনির্মিত বাটী কম আছে। খৃষ্টান ভ্রাতৃদ্বয়কে ঐ রৌপ্য-বাটীর কথা জিজ্ঞাসা করাতে শপথ-পূর্বক তাহারা ঐ বিষয়ে নিজেদের অজ্ঞতা প্রকাশ করিল। পরবর্তীতে উত্তরাধিকারীরা ঐ রূপার বাটী মক্কাবাসীদের হাতে দেখিয়া অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিল যে, ঐ দুই ব্যক্তি যাহারা মাল আমানত রাখিয়াছিল; তাহারাই রূপার বাটিটা বিক্রয় করিয়া দিয়াছিল। সুতরাং ঐ দুই ব্যক্তিকে পুনরায় মদীনায় ডাকিয়া পাঠানো হইল। তাহারা উপস্থিত হইলে, উত্তরাধিকারীরা তাহাদের উপস্থিতিতেই শপথ করিয়া বলিল, ঐ রূপার বাটী তাহাদের নিজের। অতপর, ঐ বাটি উত্তরাধিকারীগণের কাছে প্রত্যার্পণের ব্যবস্থা করা হইল (মনসুর)।

৮০১। 'আসরের' নামাযের সময়ই এই কাজের প্রকৃষ্ট সময় কারণ নবী করীম (সঃ) এই আসরের নামাযের পরক্ষণেই উপরোক্ত রূপার-বাটির ব্যাপারে সাক্ষ্য গ্রহণের কাজ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। নামাযের পরে পরেই সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণের কাজ সম্পাদন করার কারণ, সেই সময় মানুষের মন খোদা-ভীতিতে আপ্লুত থাকে এবং সত্যবাদিতার প্রতিও মনের ঝোঁক থাকে। যদি সাক্ষীরা অমুসলমান হয়, তাহা হইলে তাহাদের উপাসনার পরে পরেই তাহাদিগকে সাক্ষ্যদানের জন্য ডাকা যাইতে পারে, যাহাতে সময়ের প্রভাব ও মনের গাম্ভীর্য তাহাদিগকে সত্য কথা বলার প্রেরণা দেয়।

৮০২। 'আওলায়ান' শব্দটি প্রথম দুই সাক্ষী সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে। কেননা, সত্যিকারভাবে সাক্ষ্য দিবার জন্য তাহারাই বেশী উপযোগী ছিলেন– এই কারণে যে, মৃত ব্যক্তির মৃত্যুকালে তাহারা উপস্থিত ছিলেন এবং তাহাদের উপস্থিতিতে মৃতব্যক্তি 'উইল' (ওসীয়্যত) করিয়াছিলেন এবং তাহাদের কাছেই মাল-সম্পদ আমানত রাখা হইয়াছিল, যাহাতে উত্তরাধিকারীগণের কাছে পৌছাইয়া দেওয়া হয়। অপর দুই সাক্ষী মৃতব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের মধ্য হইতে হওয়া উচিত।

৮০৩। নবীগণের উত্তর হইতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্‌তাআলা কোন সংবাদ বা জ্ঞান লাভের জন্য প্রশ্ন করেন নাই। বরং অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে নবীদের সাক্ষ্য গ্রহণই আল্লাহ্‌তাআলার আসল উদ্দেশ্য। ৪:৪২ আয়াত হইতেও তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যায়।

৮০৪। দোলনায় থাকিতে কথা বলা দ্বারা ইহাই বুঝায় যে, ঈসা (আঃ) অল্প বয়সেই বুদ্ধিমত্তার সহিত জ্ঞান ও পুণ্যের কথা বলিতেন। এইরূপ অর্থপূর্ণ ও পুণ্যময় কথা-বার্তা বলার মধ্যে তাঁহার মাতার অবদান প্রতিফলিত হইত। কারণ তাঁহার সাধ্বী, জ্ঞানী ও ধর্মপরায়ণা মাতা যে তাঁহাকে কত যত্ন সহকারে সুশিক্ষার মাধ্যমে লালন-পালন করিয়াছিলেন, তাহা বালক ঈসার কথা-বার্তা

ও আচরণে প্রকাশ পাইত। মধ্যবয়সে ভাল ভাল কথা বলার দ্বারা বুঝা যায়, কেবল মাতা মরিয়মই যে ধর্মভীরু, পবিত্রা মহিলা ছিলেন তাহাই নহে, বরং ঈসাও স্বয়ং একজন পবিত্র ও ধার্মিক পুরুষ ছিলেন। কেননা, মধ্যম বয়সে যখন তিনি মাতার সরাসরি প্রভাবের আওতা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন তখনও তিনি জ্ঞান, প্রজ্ঞা বুদ্ধি-দীপ্ত পবিত্র কথা-বার্তাই বলিতেন।

৮০৫। দেখুন ৪২০ঘ এবং ৪২০-ঙ

৪০২-ঘ। বাইবেলে কোথাও উল্লেখ নাই যে, ঈসা (আঃ) মু'জেযা প্রদর্শন করিবার জন্য পাখী সৃষ্টি করিয়া আকাশে উড়াইয়াছিলেন। সত্যি সত্যি যদি ঈসা (আঃ) পাখী বানাইয়া উড়াইয়া থাকিতেন, তাহা হইলে বাইবেল তাহা উল্লেখ না করিয়া কীভাবে ও কেন চুপ করিয়া থাকিল? আল্লাহ্‌র কোন নবী পূর্বে এই ধরনের ঐশী-নির্দশন দেখান নাই, অথচ বাইবেল এই সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব রহিল, ইহা আশ্চর্য নয় কি? বাইবেলে এই মহা-নিদর্শনের উল্লেখ থাকিলে, সকল নবীর উপর ঈসা (আঃ)-এঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইত এবং পরবর্তী কালের খৃষ্টানেরা ঈসার প্রতি যে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়াছে, তাহাও কিছুটা সমর্থন লাভ করিত। 'খাল্‌ক' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ঃ (১) মাপ বা ওজন করা, পরিমাণ ঠিক করা, নক্সা তৈরী করা, (২) আকৃতি দেওয়া, তৈরী করা, সৃষ্টি করা ইত্যাদি অর্থও রহিয়াছে। এখানে প্রথমোক্ত অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। 'সৃষ্টি করা' অর্থে 'খাল্‌ক' শব্দটি কুরআনের কোথায়ও আরোপিত হয় নাই (১৩:১৭; ১৬:২১; ২২:৭৪; ২৫:৪; ৩১:১১-১২; ৩৫:৪১ এবং ৪৬:৫)। উপরোক্ত ব্যাখ্যার আলোকে এবং 'কাদামাটি'র রূপক অর্থ সম্মুখে রাখিয়া, "তোমাদের জন্য কাদা হইতে আমি পাখীর অবস্থার (অনুরূপ) সৃষ্টি করিব, অতঃপর উহার মধ্যে আমি (নবজীবন) ফুৎকার করিব, ফলে ইহা আল্লাহ্‌র আদেশে উড্ডয়নশীল হইয়া যাইবে" ইত্যাদি কথার মর্ম বুঝিবার চেষ্টা করিলে, ইহার তাৎপর্য দাঁড়াইবে এই যে, সাধারণ শ্রেণীর লোক– যাহাদের মধ্যে উন্নতি ও জাগরণের শক্তি রহিয়াছে, তাহারা যদি ঈসা (আঃ)-এর সংস্পর্শে আসে ও তাঁহার বাণী গ্রহণ করিয়া জীবন যাপন করে, তাহা হইলে তাহাদের জীবনে আমূল পরিবর্তন আসিয়া যাইবে। ধূলি-ধূসরিত, সংসারাসক্ত, বস্তু-কেন্দ্রিক জীবনকে জলাঞ্জলি দিয়া, তাহারা আধ্যাত্মিক আকাশের উচ্চ মার্গে পাখীর মত বিচরণ করিতে সমর্থ হইবে এবং বস্তুতঃ, তাহাই ঘটিয়াছিল। ঘৃণিত, অবহেলিত গেলিলীর জেলেরা, তাহাদের প্রভু ও গুরুর উপদেশ ও উদাহরণ অনুসরণের মাধ্যমে, পাখীরই মত উচ্চমার্গের আরোহণ করিয়া বনী ইসরাঈল জাতির মধ্যে আল্লাহ্‌র বাণী প্রচারের তৌফীক লাভ করিয়াছিল। অন্ধ ও কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তদের রোগমুক্তির বা উপশম দানের সম্বন্ধে বলা যায় যে, এই ধরনের রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে বনী ইসরাঈল জাতি অপবিত্র ও নোংরা জ্ঞানে, সমাজের সংশ্রব হইতে দূরে রাখিত; সমাজে ঘেঁষিতে দিত না। 'আমি নিরাময় করিব' কথাটির তাৎপর্য ইহাই যে, এই সব রোগাক্রান্ত লোকেরা আইনগত ও সমাজগতভাবে অবহেলিত অবস্থায় বহু বঞ্চনা ও অসুবিধার মধ্যে ঘৃণার পরিবেশে বাস করিত। ঈসা (আঃ) আসিয়া তাহাদিগকে সেবা যত্ন করার তাগিদ দিয়া, সমাজে তাহাদিগকে স্থান দান করিয়া, তাহাদিগকে দুর্বিসহ জীবন হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। ইহাও হইতে পারে যে, ঈসা (আঃ) এই সব রোগীকে সুস্থ করিতেন। আল্লাহ্‌র নবীগণ আধ্যাত্মিক চিকিৎসক বিশেষ। তাহারা আধ্যাত্মিক অন্ধগণকে চক্ষু দান করেন, বধিরকে শ্রবণশক্তি দান করেন, আধ্যাত্মিক মৃতদিগকে জীবন দান করেন (মথি-১৩:১৫)। এখানে 'আক্‌মাহ' (রাতকানা) অর্থ ঐ লোক যাহার বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও দুর্বল মানসিকতার কারণে পরীক্ষার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে না। সে দিনের আলোতে দেখে অর্থাৎ যতক্ষণ পরীক্ষার ঝামেলা থাকে না এবং বিশ্বাসের সূর্য মেঘ-দুর্যোগ হইতে মুক্ত অবস্থায় কিরণ দেয়, তখন সে ঠিকই দেখে। কিন্তু যখন দুর্যোগের রাত্রি নামিয়া আসে অর্থাৎ পরীক্ষা ও আত্মোৎসর্গের সময় উপস্থিত হয়, তখন সে আধ্যাত্মিক আলো হারাইয়া ফেলে এবং থামিয়া যায় (২:২১)। তেমনিভাবে, 'আব্রাস' (কুষ্ঠরোগী) শব্দটি আধ্যাত্মিক অর্থে রুগ্ন ও দুর্বল বিশ্বাসকে বুঝাইয়াছে, যাহার আবরণ স্থানে স্থানে সুস্থ আবার স্থানে স্থানে ক্ষতপূর্ণ।

'আমি মৃতগণকে জীবন দান করিব' বাক্যটির অর্থ ইহা নয় যে, ঈসা (আঃ) মৃত ব্যক্তিকে সত্যই জীবিত করিয়াছিলেন। যাহারা প্রকৃতই মরিয়া যায়, তাহারা পৃথিবীর বুকে কখনও পুনর্জ্জীবিত হয় না। এইরূপ বিশ্বাস কুরআনের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরপীত (২:২৯; ২৩:১০০-১০১; ২১:৯৬; ৩৯:৫৯-৬০; ৪০:১২; ৪৫:২৭)। আধ্যাত্মিক পরিভাষা মতে, নবীগণ তাহাদের অনুসারীদের জীবনে যে বৈপ্লবিক ও অসধারণ মহা-পরিবর্তন আনয়ন করেন, উহাকেই বলা হয় 'মৃতকে জীবিত করা'।

৮০৬। এখানে ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করার জন্য ইহুদীদের দ্বারা তাঁহাকে ক্রুশে লটকানোর ঘটনা এবং এই ঘটনার হইতে ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্ কর্তৃক বাঁচাইয়া দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে।

৪২০-ঙ। আকমাহা অর্থ রাতকানা, জন্মান্ধ, যে পরে অন্ধ হইয়াছে, যাহার জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তি-শক্তি নাই (মুফরাদাত)।

হাদীস শরীফ

নিয়্যতের উপর কর্ম নির্ভরশীল

কুরআন

إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের মনের কথা গোপন রাখো অথবা প্রকাশ কর তা সবই আল্লাহ্ জানেন, *(সূরা আলে ইমরান: ৩০ আয়াতাংশ)*

হাদীস

وَعَنْ أَبِي مُوسَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً أَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ۔

অর্থাৎ: আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, (হে আল্লাহ্‌র রসূল!) কেউ বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য লড়াই করে, কেউ আত্ম-সম্মান ও বংশগত মর্যাদার জন্যে লড়াই করে, আবার কেউ বা লোক দেখানোর জন্য লড়াই করে-এদের মধ্যে কে আল্লাহ্‌র পথে? রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহ্‌র কলেমা উঁচু করার জন্য (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বাণী প্রচারে সংগ্রামরত) সংগ্রাম করে সে-ই আল্লাহ্‌র পথে, *(বুখারী-মুসলিম)*

ব্যাখ্যা :

আল্লাহ্‌তাআলা পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন যেন তার নিজের কর্ম দ্বারা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর পসন্দনীয় কর্ম সম্বন্ধে মানবজাতিকে অবগত করার জন্য এ পৃথিবীতে নবী-রসূল প্রেরণ করেছেন। নবী-রসূলগণ তাঁদের সম্বোধনকারীদের জানিয়ে

দিয়েছেন যে, কি করলে ও কোন কাজ করলে তাদের প্রভু সন্তুষ্ট হবেন। মানুষ এ পৃথিবীতে কর্ম করে নিজের জীবিকা নির্বাহের জন্য, অপরকে সহযোগিতা করার জন্য ও খোদার সন্তুষ্টির জন্য। এভাবে নিজের জীবিকা নির্বাহ করা ছাড়া অন্য যে সকল কর্ম করে উহা হয় সে খোদার সন্তুষ্টির জন্য করে অথবা নিজের স্বার্থের জন্য করে অথবা লোক দেখানোর জন্য করে থাকে যেন লোকেরা তার সুনাম ও প্রশংসা করে। আল্লাহ্ বলেন, মানুষ যা কিছু করে সে সম্বন্ধে তিনি সব কিছুই জানেন, মানুষ তার কর্মের পিছনের নিয়্যতকে যতই গোপন করুক আল্লাহ্ তা জানেন অর্থাৎ মানুষ যে কর্ম করে উহার ফল সে তার নিয়্যত অনুযায়ী পাবে। গোপন নিয়্যতকে আল্লাহ্ জানেন। হাদীস শরীফে আল্লাহ্র রসূল (সঃ) বলেছেন, এমন কর্ম আল্লাহ্র দৃষ্টিতে প্রশংসারযোগ্য যদ্বারা তাঁর মহিমা প্রকাশ পায় আর কর্মের দিক হতে সবচে' উত্তম হলো আল্লাহ্র বাণী প্রচার করা। উপরোক্ত হাদীসে আল্লাহ্র রসূল (সঃ) এ বিষয়টিকে পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, জেহাদের ময়দানে মানুষ বিভিন্ন নিয়্যতে অংশ গ্রহণ করে থাকলেও আল্লাহ্র দৃষ্টিতে উহার কোন মূল্য নেই। আল্লাহ্র দৃষ্টিতে উহাই মূল্য রাখে যা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়। ঠিক এভাবেই অন্যান্য কর্মেও মানুষের নিয়্যত ভিন্ন হয়ে থাকে। সেখানেও ঐ একই নীতি কাজ করে অর্থাৎ যা কিছুই কর না কেন উহার মূলকে আল্লাহ্ জানেন ও আল্লাহ্তাআলা তদনুযায়ী সেই কর্মের প্রতিদান দিবেন।

আমরা যেন আমাদের কর্মের প্রতি দৃষ্টি রেখে নিজেদের নিয়্যতকে সঠিক করি। এই তৌফীক আল্লাহ্তাআলা আমাদের সবাইকে দান করুন, আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা - মাওলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী

অমৃত বাণী

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)

গুনাহ্ সে নাজাত কিঁউ কার মিল সাকতি হ্যায়

(পাপ থেকে মুক্তি কীভাবে লাভ করা যায়?)

(৪র্থ কিস্তি)

এই বাড়াবাড়ি ও শিথিলতাতো হলো নবুওয়ত ও পরকাল সম্বন্ধে। কিন্তু এছাড়া মুসলমানদের সামাজিক কাজ-কর্মে, কথায় কথায় বাড়াবাড়ি ও শিথিলতা দেখা যায়। তাদের কথায় কাজে স্বভাবে, বিবাহ-তালাকে, স্ত্রী নিয়ে বসবাসে, একতায়, ক্রোধ-করুণায়, প্রতিশোধ-ক্ষমায় কোন ক্ষেত্রেই মিতাচার নেই। সংক্ষেপে, এই জাতির মাঝে আজব ধরনের অনিয়মের ঝড় বয়ে যাচ্ছে, মুর্খতার কোন শেষ নেই– পথভ্রষ্টতার কোন সীমা পরিসীমাও নেই। আল্লাহ্র তৌহীদ ও মধ্যপন্থার পাগড়ী পড়ে যে জাতির আবির্ভাব হয়েছিল, তাদেরই অমিতাচারের অবস্থা যখন এরূপ, সেক্ষেত্রে অন্য জাতির সম্বন্ধে আক্ষেপ বা আলোচনার আর কী থাকে?

খৃষ্টানদের কেন্দ্র এমন একটি ক্ষেত্রস্বরূপ সেখানে উন্নত জ্ঞান ও শক্তিশালী মস্তিষ্কের চরম উৎকর্ষ থেকে অনেক কিছু আশা করা হচ্ছিল। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হয়, বিজ্ঞান ও দর্শনের অধ্যয়ন করে ধর্ম এবং আল্লাহ্র একত্বের বিষয়ে তারাও বরবাদ হয়ে গেছে। একদিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় জাগতিক ক্রিয়া কর্মের ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলা এবং আগামী দিনের নব নব শিল্পের উদ্ভাবনের ব্যাপারে তারা চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। আবার যখন অপরদিকে দেখি যে, খোদাতাআলার পরিচয় লাভের ব্যাপারে তাদের কতটুকু অধঃপতন হয়েছে এবং কীভাবে একজন দুর্বল মানুষকে সমস্ত বিশ্বের প্রভু হিসেবে গণ্য করেছে, তখন বিস্ময় জাগে যে, জাগতিক কাজ কর্মে তারা কত পারঙ্গম আর খোদাকে জানার ব্যাপারে তাদের এরূপ বুদ্ধি ও বিচক্ষতার এই বলিহারি! যখন চিন্তা করি খৃষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে বাড়াবাড়ি ও শিথিলতার দিক থেকে বৈশিষ্ট্যমূলক চিহ্ন কী, তখন এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, মুসলমানদের মধ্যে অনেকে এরূপ আছে যারা মানুষের অধিকার হরণ করে থাকে এবং খৃষ্টানদের মাঝে এমন লোক রয়েছে যারা খোদার অধিকারকে হরণ করেছে। কেননা, জেহাদের মতবাদের ভ্রান্তধারণা মুসলমানদেরকে এমন হৃদয়হীন করে ফেলেছে যে, মানবজাতির প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা তাদের অন্তর থেকে তিরোহিত হয়েছে। তাদের মধ্য থেকে অসভ্য শ্রেণীর লোকেরা কীরূপ সামান্য ব্যক্তিগত স্বার্থে অথবা অন্যায় আবেগে নিষ্পাপ মানুষকে হত্যা করতেও প্রস্তুত হয়ে যায়, বিবস্ত্র করে জিনিসপত্র ছিনিয়ে নিতে ওদের বাধে না এবং এভাবে তারা মানবজাতির অধিকারের এক প্রয়োজনীয় অংশকে বিনষ্ট করে মানবতার প্রতি কলঙ্ক লেপন করেছে। আবার যখন খৃষ্টানদের অবস্থা সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করি তখন অতি সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, তারা খোদাতাআলার অধিকারকে হরণ করতে চেষ্টার কোন ত্রুটি করে নি এবং একজন দুর্বল মানুষকে অযথা খোদা বানিয়ে রেখেছে। আর যে উদ্দেশ্যে খোদা বানানো হয়েছে তা-ও পূর্ণ হয় নি।

পাপ থেকে পরিত্রাণ লাভের এটাই যদি ব্যবস্থাপত্র হতো যে, ঈসা মসীহের রক্তের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে, তাহলে ইউরোপীয়দের দুনিয়ার পূজা ও বিভিন্ন প্রকারের অবৈধ যৌন সম্পর্কীত পাপ থেকে, যার উল্লেখ করতেও লজ্জাবোধ হয়, এই ব্যবস্থাপত্র কেন পবিত্র করতে পারে নি? বরং এর বিপরীতে (ঐ পাপাচার) অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে– এশিয় দেশসমূহ থেকে পাপ কর্মে ইউরোপ কি কিছু কম যাচ্ছে? তাহলে কেন এই অকার্যকর ব্যবস্থাপত্র পুনঃ পরীক্ষা করা হয় নি। এ পৃথিবীতে স্থায়ী স্বাস্থ্যের জন্য প্রত্যেক ডাক্তার ও রোগী এই রীতি অনুসারণ করে চলেছে যে, এক ব্যবস্থাপত্রে এক সপ্তাহে বা দশদিনের মধ্যে উপকার দেখা না গেলে সেই ব্যবস্থাপত্র পরিবর্তন করে আরও কোন ভাল ব্যবস্থার চিন্তা করা হয়। তাহলে ভুল সাব্যস্ত হবার পর এ পর্যন্ত আজও কেন এ ব্যবস্থাপত্র বদলানো হয় নি? 'মসীহের রক্তের উপর বিশ্বাস আনয়ন প্রকৃত মুক্তি দান করে'– ১৯০০ বৎসর বিফলে অতিবাহিত হবার পরও কি এরূপ ধারণা পোষণ করা উচিত? অথবা এটি কি আশা করা যাবে যে, বর্তমান কাল অব্দি যদিও কোন বিশিষ্ট মীমাংসাকারীর আবির্ভাব ঘটে নি কিন্তু ভবিষ্যতে সেই যুগ আসবে যখন দুনিয়াতে খৃষ্টানগণ পাপাচার ও মাতলামী থেকে সবার চাইতে অধিক আত্মসংযমী হবে? ইউরোপের যেকোন দেশে বসবাসকারী কোন ব্যক্তি যদিও সাক্ষ্য দেন যে, এই উক্তিগুলি সঠিক কিন্তু প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি যিনি কখনো ইউরোপ ভ্রমণ অথবা প্যারিস বা অন্যান্য শহরে কিছুদিন অবস্থান করেছেন, তিনি এই সাক্ষ্য দিতে কোন দ্বিধা করবেন না যে, – বর্তমানে ইউরোপের কতক অংশের অবস্থা এই পর্যায়ে পৌছেছে যে, অনেকের দৃষ্টিতে ব্যভিচার কোন পাপই নয়। তাদের বিবেচনায় একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করা নিষিদ্ধ কিন্তু কু-দৃষ্টি নিষিদ্ধ নয়। একথা সত্যি যে, ফ্রান্স ও অন্যান্য স্থানে লক্ষ লক্ষ মহিলা রয়েছে যাদের স্বামীর প্রয়োজন নেই। সুতরাং হয়তো এখন একথা বলতে

হবে যে, তাদের জন্য ইন্‌জীল থেকে কোন নূতন শ্লোক বেরিয়ে এসেছে যদ্বারা এসব কার্যকলাপ হালাল (বৈধ) হয়ে গেছে, অথবা অবশ্যিই বলতে হবে যে, মসীহ্‌র রক্তের ব্যবস্থাপত্র বিপরীত প্রভাব সৃষ্টি করেছে এবং দাবী ভুল প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু আসল কথা এই যে, প্রকৃতপক্ষে এই ব্যবস্থাপত্রই সঠিক ছিল না এবং একের মৃত্যুতে অপরের মুক্তিলাভের মধ্যে কোন বাস্তব সম্পর্ক নেই। আল্লাহ্‌তাআলা জীবিত থাকাই হলো সকল কল্যাণের কেন্দ্র– তাঁর মৃত্যুতে নয়। সুর্য ডুবলে নয়-সূর্যোদয়েই আলোর জন্ম। যেহেতু এই ব্যবস্থাপত্রে পাপ থেকে পবিত্রতা লাভের উদ্দেশ্য সফল হতে পারে নি, সুতরাং এ মতবাদও আর সঠিক থাকলো না যে, তিনি (ঈসা-আঃ) খোদার পুত্র ছিলেন যিনি এই উদ্দেশ্যে নিজের জীবনকে ধ্বংস করেছেন। আমরা খোদা সম্বন্ধে এ ধরনের মৃত্যু-চিন্তা করতে পারি না যে, জীবনও দিতে হলো অথচ কাজও কিছু হলো না। প্রথমে তো এ কথাই খোদাতাআলার আদি ঐশী বিধানের পরিপন্থী যে, খোদা স্বয়ং নিজের মৃত্যু, ধ্বংস, সর্বপ্রকার ক্ষতি ও অপমান স্বীকার করে নিয়ে এক নারীগর্ভে জন্ম নিতে পারেন। কেননা, এই দাবী কোন দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণিত হয় নি যাতে একথা বোধগম্য হয় যে, এর আগেও খোদাতাআলা দু'চার বার এরূপ প্রক্রিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছেন আর মানুষ মনে সান্ত্বনা পেয়েছে, আর না মানবীয় অলৌকিকতার সীমা বহির্ভূত খোদাতাআলার বিস্ময়াতীত ক্রিয়া প্রদর্শনে এ দাবীকে প্রমাণের চূড়ান্তে পৌছানো হয়েছে। এতদ্ব্যতীত যে কারণে এই মতবাদের সৃষ্টি সেই আসল উদ্দেশ্যই একেবারেই লুপ্ত রয়েছে। দুনিয়াতে ইন্দ্রিয় লালসা চরিতার্থে প্রধান দু'টি পাপের একটি হলো মদ্যপান আর অপরটি ব্যভিচার, এখন বলুন, একথা কি সত্য নয় যে, ইউরোপের অধিকাংশ পুরুষ ও নারী এ উভয় পাপ-কর্মে পুরোপুরি লিপ্ত রয়েছে? বরং এতে আমি কোন অতিশয়োক্তি করছি না যে, মদ্যপানের ক্ষেত্রে এশিয়ার সকল দেশের তুলনায় ইউরোপ অগ্রগামী রয়েছে এবং ইউরোপের অধিকাংশ শহরে এত অধিক মদের দোকান রয়েছে যে, আমাদের এখানকার ছোট ছোট শহরের সব রকমের দোকান একত্রিত করলেও তার চেয়ে সংখ্যায় কম হবে। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, মদ হলো সকল পাপের মূল। কেননা, কয়েক মিনিটের মধ্যেই মদ মানুষকে মাতাল করে খুন করতেও দুঃসাহসী করে তোলে। আর অন্যান্য পাপাচার হলো এর জরুরী উপাদান। আমি সত্যি সত্যি এবং জোরের সাথে বলছি, মদ ও তাক্‌ওয়া (খোদা-ভীরুতা) কখনও একত্রিত হতে পারে না। যে ব্যক্তি এর অশুভ পরিণাম সম্বন্ধে অজ্ঞ সে বুদ্ধিমান নয়। এতে আরও একটি বড় বিপদ রয়েছে যে, এ অভ্যাস ত্যাগ করা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। (চলবে)।

অনুবাদ- **মোহাম্মদ ফজলুল করীম**

ওয়াক্‌ফে নও সৈন্যদের উপর আগামী ২০ সাল পরে অনেক বড় বড় দায়িত্ব অর্পিত হবে

খোদাতাআলার পবিত্র আমানত এখন আপনার ঘরে বড় হচ্ছে এ পবিত্র আমানতের প্রতি কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে।

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) ৩ এপ্রিল ১৯৮৭ ইং এই মহান ইলাহী তাহরীক শুরু করেন। এখন পর্যন্ত অনেক খুতবায় তিনি এ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ নসিহত করেছেন। এগুলো যথাসময়ে প্রকাশিত হয়েছে। ঐ অমূল্য হেদায়াতের মধ্য থেকে কতিপয় পিতা-মাতা এবং সেক্রেটারী ওয়াক্‌ফে নওদের কর্তব্য সম্বন্ধে উল্লেখ করা হল :

❑ মানব জীবন তাক্‌ওয়ার মাধ্যমে সুন্দর হয়। আল্লাহ্‌তাআলার প্রতি প্রেম এবং তাঁর ভালোবাসার ফলে মানব জীবনের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয়। অতঃপর ওয়াক্‌ফে নও শিশুদেরকে বাল্যকাল থেকে মুত্তাকী এবং আল্লাহ্‌তাআলার সাথে ভালোবাসার অভ্যাস সৃষ্টি করান।

❑ বাল্যকাল থেকেই এই সমস্ত শিশুদের হৃদয়ে কোমলতার সৃষ্টি করা দরকার। ওয়াক্‌ফে নওদের সাথে কঠিন আচরণ করা চলতে পারে না। কঠিন আচরণের অধীন প্রতিপালিত ওয়াকফে জীন্দেগী জামাতের মধ্যে সমস্যার সৃষ্টি করে। অনেক সময় অনেক বড় বড় ফিতনার সৃষ্টি করে। এ জন্য সরলমনা এবং ধৈর্য শক্তিসম্পন্ন অর্থাৎ যে কোন কথাকে বরদাশ্‌ত করার অভ্যাস করার গুণ ওয়াকফে নও শিশুদের বিশেষ জরুরী।

❑ ওয়াক্‌ফে নও-তে যে শিশু যোগ দিয়েছে বাল্যকাল থেকেই তার মধ্যে সত্য বলার প্রতি অনুরাগী এবং মিথ্যা বলার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হওয়া দরকার। এ জন্য পিতা-মাতাকে পূর্ব হতেই সত্যবাদী হতে হবে।

❑ বালকাল হতেই শিশুদের বুদ্ধিমান বানাতে হবে এবং লোভ-লালসা থেকে দূরে রাখতে হবে।

❑ এ সমস্ত শিশুকে আমানত এবং খেয়ানতের সম্পর্কে উন্নত মানের শিক্ষা দেয়া জরুরী।

❑ শুরু থেকেই এই সমস্ত শিশুকে কুরআন করীমের শিক্ষার প্রতি মনোযোগী করা দরকার।

❑ বালকাল থেকেই নামাযের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে এবং নামাযের ফরয সম্পর্কে শিক্ষা দেয়াও পিতা-মাতার কর্তব্য।

❑ ওয়াকফে নও শিশুদের জ্ঞানের ভিত্তি মজবুত হওয়া দরকার। তাদের সাধারণ জ্ঞান বাড়ানোর জন্য মনোযোগী হওয়া দরকার এবং পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

❑ বাল্যকাল হতেই নেযামে জামাতের প্রতি আনুগত্যের অভ্যাস করাতে হবে এবং জামাতের কর্মকাণ্ডের সাথে সু-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করা অনেক জরুরী।

❑ তাদেরকে উর্দূ এবং আরবী ভাষা শিক্ষা দেয়া খুবই জরুরী।

❑ তাদেরকে ঘরের কাজ, আদব-কায়দা এবং ঘরের হিসাব সম্পর্কেও ভালোভাবে শিক্ষা দেওয়া দরকার।

❑ এমনভাবে তাদের তরবীয়ত করুন যেন তারা সরল জীবন-যাপন এবং কঠোর জীবন-যাপন সম্পর্কেও অভ্যস্ত হয়।

❑ ওয়াক্‌ফে নও-এর জন্য অবশ্যই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও জ্ঞান দান করা দরকার।

❑ এই জন্য হিসাব-রক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কেও শিশুদের শুরু থেকেই শিক্ষা দিতে হবে। আর তাদেরকে বাল্যকাল থেকেই তরবীয়ত দিতে হবে যে, কীভাবে টাকা-পয়সার হিসাব রাখতে হয়।

❑ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শিশুদেরকে তাক্‌ওয়ার সূক্ষ্ম তত্ত্ব শিক্ষা দিতে হবে।

❑ নিজের শিশুদের এভাবে সুন্দর চরিত্রের তরবীয়ত করতে হবে যেন তারা মানুষের সঙ্গে মিষ্টি ভাষায় কথা বলতে পারে এবং ভালবাসার মাধ্যমে মন জয় করতে পারে। অনেক লোক শত্রুর মনকেও জয় করতে পারে। উন্নত সমাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। কেননা, উহা ছাড়া না তরবীয়ত হতে পরে, আর না তবলীগ হতে পারে।

❑ নিজের শিশুদের জন্য দোয়া করুন এবং তাদেরকেও দোয়া করার তরবীয়ত করুন যেন তারা আল্লাহ্‌তাআলার সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক কায়েম করে নিজের ব্যক্তিত্বকে বাড়াতে পারে। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের তৌফীক দিন যেন আমরা 'ওয়াক্‌ফে নও'-এর এক এক সৈন্যকে খোদার রাস্তায় পেশ করতে পারি, যারা সব রকমের অস্ত্রের মাধ্যমে সু-সজ্জিত হবে, যা আল্লাহ্‌তাআলার রাস্তায় জেহাদের জন্য অবশ্যই জরুরী হবে। (ওয়াক্‌ফে নও, বিভাগ, তাহরীকে জাদীদ, কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত)।

সংগ্রহ ও অনুবাদ - **আব্দুল মতীন**, ছাত্র, মাদ্রাসা আহমদীয়া, কাদিয়ান

ইবাদতের প্রাণ তাকওয়ার মধ্যে নিহিত

[সাইয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) প্রদত্ত ৪ ডিসেম্বর, ১৯৯৮, মসজিদে ফযল, লন্ডন]

তাশাহ্হুদ, তায়াওউয, এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) সূরা বাকারার ১৭৩ নং আয়াত পাঠ করে বলেন, গত জুমুআয় আমি উপরোক্ত আয়াত এবং সূরা নহলের ১১৪, ১১৫ নং আয়াত পড়েছিলাম, অতএব, এবার পড়লাম না। যে বিষয়ে বক্তব্য রাখছিলাম তা শেষ হওয়ার পূর্বেই সময় শেষ হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং বাকী অংশ আজ বর্ণনা করছি। তার পূর্বে ঘোষণা দিতে চাচ্ছি যে, আল্লাহ্‌র ফযল ও রহমতে আজ কাদিয়ান দারুল আমান এর ১০৭তম সালানা জলসা আরম্ভ হতে যাচ্ছে। আজ নয় বরং আগামী কাল আরম্ভ হবে এবং উদ্বোধনী ভাষণ দেব, ইনশাল্লাহ্। কিছু দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় নসিহত ও হিতোপদেশ এমন যা আজই বর্ণনা করা আবশ্যক বলে মনে করি। হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) এই জলসা সম্পর্কে যেসব নসিহত করেছেন আমি তা আগামীকাল উদ্বোধনী ভাষণে বর্ণনা করব, ইনশাল্লাহ্।

জলসার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নসিহতসমূহের মধ্যে সর্ব প্রধান বিষয় হচ্ছে পরস্পর ভ্রাতৃত্ববোধ ও ভালবাসার পরিবেশ বজায় রাখা। যদি কারো সাথে কোন মনোমালিন্য থেকেও থাকে তবে তা ভুলে যাওয়া একান্ত আবশ্যক। কাদিয়ানের এ জলসায় এমন গভীর স্নেহ-মমতা ও গভীর ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ সৃষ্টি করা একান্ত জরুরী। প্রত্যেক ব্যক্তি যারা বাইরে থেকে আসবেন তারা যেন অনুভব করেন যে, আমরা সকলেই এমন এক জামাতের সদস্য, যে জামাত হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সৃষ্টি করেছিলেন। আপনারা সকলে মু'মিন ভাই ভাই হয়ে যান। কোন পার্থক্য সৃষ্টিকারী কথাও না আর কাজে কর্মেও-এর কোন আভাসও না। এবার অনেক বড় সখ্যায় নবদীক্ষিতরা অংশগ্রহণ করবেন। ইতঃপূর্বে কখনও কাদিয়ান জলসায় এত বড় সংখ্যায় নব-দীক্ষিতরা আসে নি। তারা এবার জামাতের দূত হয়ে নিজ নিজ অঞ্চলে ফেরত যাবেন এবং এখানে যা যা দেখলেন তা বর্ণনা করবেন। তারা এখান থেকে মনের মধ্যে তাদের কিছু অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা নিয়ে যাবেন এবং নিজ অঞ্চলে গিয়ে বর্ণনা করবেন, তখন তাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতা ও প্রাপ্তির কথাও বলবেন- সেটা বড় রকমের প্রভাব ফেলবে। তারা এখান থেকে যে মনোবল নিয়ে যাবেন এর মধ্যে আপনাদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। যারা এখন কাদিয়ানে বসবাস করেন তারা যদি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ভালবাসা দিয়ে বহিরাগতদের সেবা করেন-এবং আমরা সবাই ভাই-ভাই, সবাই এক – এই অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন তবে নিশ্চয় তারা অনুভব করবেন এবং নিজ অঞ্চলে গিয়ে তার যে বর্ণনা দিবেন এর মধ্যে একটা শক্তি সৃষ্টি হবে। নতুবা এটি একটি সাধারণ বিষয় হবে। সুতরাং আপনাদের আচরণ অত্যন্ত অর্থবহ হবে যে, আপনারা সবাই অসাধারণ এক ঈমানী শক্তির দ্বারা ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ এবং ভালবাসার এক মধুর সম্পর্কে আবদ্ধ। প্রত্যেক দর্শক এটাকে দেখবে এবং অনুভব করবে।

এ সম্পর্কে এ কথাও গুরুত্বপূর্ণ যে, তাদের সকল প্রকার প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। সকলের সব ধরনের প্রয়োজন এক হিসাবে পূরণ করা তো অসম্ভব কারণ প্রত্যেকের প্রয়োজন তো ভিন্ন ভিন্ন। হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর নীতি ছিল এই যে, প্রত্যেকের ব্যক্তিগত প্রয়োজনেরও খোঁজ নিতেন। এমন কি কারো যদি ধূমপানের অভ্যাস থাকতো তবে তাৎক্ষণিকভাবে তার প্রয়োজন মেটানো হত। কারণ ধূমপানের অভ্যাস পরিত্যাগ করানোর প্রচেষ্টার জন্য দীর্ঘ সময় ও সাধনার দরকার। কারো পান-এর অভ্যাস থাকলে দূর শহরে লোক পাঠিয়ে পান আনিয়ে দেয়া হয়েছে। এখন যেহেতু মেহমানদের সংখ্যা অনেক বেশী। দশ হাজারেরও বেশী নব-দীক্ষিতরা এবার জলসায় অংশগ্রহণ করবেন, ইনশাল্লাহ্। অতএব, এতগুলো লোকের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটাতে আপনারা সক্ষম হবেন এমন আশা আমি করি না। কিন্তু যতদূর সম্ভব এমন প্রয়োজনগুলো সবারই যা প্রয়োজন তা তো মেটানোর অবশ্যই চেষ্টা নিতে হবে। ব্যক্তিগত প্রয়োজনের মধ্যে কিছু কিছু এমন আছে যা পূরণ করার চেষ্টাও করতে হবে। যেমন কেউ হয়ত শীতে কাঁপছেন, দূর থেকে এসেছেন এমন গরম অঞ্চল থেকে এসেছেন তার শীতবস্ত্রের প্রয়োজন হতে পারে। অনেকে যারা শীত প্রধান অঞ্চল থেকে এসেছেন তারা হয়ত শীতের জন্য গরম কাপড় সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। যারা গরম অঞ্চল থেকে আসছেন তাদের জন্য আমরা চেষ্টা নিয়েছিলাম তারা যেন যাত্রার পূর্বেই প্রয়োজনীয় গরম বস্ত্র পেয়ে যান এবং সঙ্গে নিয়ে আসেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও হয়ত এমন অনেকেই বাদ পড়ে গেছেন এবং শীতবস্ত্র পান নি। এমন ব্যক্তি যদি চোখে পড়ে যে, গরীব মানুষ পায়ে জুতো নেই বা মোজা নেই শীত নিবারণের পুরো ব্যবস্থা নেই। এটা তার ব্যক্তিগত প্রয়োজন, তবুও দৃষ্টি রাখা দরকার। জলসায় উপস্থিত সবারই এমন বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন। তিনি কাদিয়ানের অধিবাসী হোন আর বাইরেরই হোন।

দ্বিতীয়তঃ কোন কমবেশী হয়ে যাওয়াকে ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখুন। কখনও কখনও কোন প্রকার ব্যতিক্রম হয়েও যায়। অনেক সময় এমন হয় যে, দূর থেকে মেহমান নিয়ে যারা আসেন আমাদের কোন কর্মকর্তা। তিনি দেখেন যে, তার দায়িত্বাধীন তার কাফেলার মেহমানদের অসুবিধা হচ্ছে- তিনি কাদিয়ানের কর্মকর্তার উপর রেগে গিয়ে চড়াও হন। সবারই ব্যক্তিগত স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন। আমাদের বহুদিনের অভিজ্ঞতা অনেকে গরম মেজাযের মানুষ হয়ে থাকেন। নিজে আহমদী হিসাবে নিজের অসুবিধা সহ্য করে নেন কিন্তু মেহমানের কষ্ট হলে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েন। উচ্চ কণ্ঠে চিৎকার করেন, প্রতিবাদও করেন। অনেকে কাশ্মীরের বিশেষ সম্মানিত মেহমান ছিলেন। এবারও কাশ্মীরের অনেক সম্মানিত মেহমান আসছেন। এটা একটা নতুন রেকর্ড হবে। কারণ অতীতে কখনও এত বেশী মেহমান আসে নি। সবাই চেষ্টা করবেন। কারো পক্ষ থেকে কম-বেশী হয়ে গেলে ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। যারা মেহমান তারাও যেন ধৈর্য-সহ্যের পরিচয় দেয়। কিছু কিছু কষ্ট এমন যে, শত চেষ্টা সত্ত্বেও হয়েই যায়। চেষ্টা

করেও তা থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয় না। অনেক বড় সমাবেশে সকল বিষয় মেটানো সম্ভব হয় না। উভয় পক্ষের সচেষ্ট হওয়া দরকার এবং ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা দরকার।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। এটি এমন একটি নসিহত। যার উপর এখন থেকেই আমল আরম্ভ করা দরকার এবং ব্যবস্থা করা দরকার। অনুন্নত দেশগুলোতে এর কোন ব্যবস্থা নেয়া হয় না। আবর্জনা এখানে ওখানে ছড়িয়া ছিটিয়ে ফেলে দেয়া হয়। এখানে আমরা জলসার সময় ব্যবস্থা নিয়েছিলাম। আমি চাই যে, কাদিয়ান জলসাতেও ব্যবস্থা নেয়া হোক। কোন ময়লা-আবর্জনা যেখানে সেখানে সড়কের উপর ফেলা যাবে না। সড়ক-গলি যেন পরিষ্কার রাখা হয়। আমাদের এখানে তো পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার করা খুবই সম্ভব। ওখানে যদি সম্ভব হয় তবে যেন সরবরাহ করা হয়। সবাই নিজের কাছে পলিথিনের ব্যাগ রাখবেন। নিজের ব্যবহৃত আবর্জনা ঐ ব্যাগের মধ্যে রাখবেন। ওখানে তো গরীব সমাজের মানুষের নিকট এ ব্যাগ ভাল লাগবে। এখানে তো আপনারা ব্যাগসহ ডাষ্টবিনে ফেলে দেন। ওখানে তারা ব্যাগ খালি করে ডাষ্টবিনে ফেলে দিবে এবং ব্যাগটা সঙ্গে রেখে নিবে। এই উদ্দেশ্যে যদি কমবেশী দশহাজার ব্যাগ ক্রয় করে নেয়া হয় মন্দ কি? যদি ওখানে সম্ভব হয় তবে তারা যেন ওখানে কিনে নেন।

নামায বা-জামাত আদায়ের সু-ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রত্যেক জলসায় আমি এ ব্যাপারে তাগিদ করেছি। **যারা নবাগত তাদের প্রধানতঃ নামাযই তো শিখাতে হবে। যদি নামাযে অবহেলা হয় তবে তো কোনই লাভ হবে না। সুতরাং কেবল নামাযই নয় বরং বা-জামাত নামাযও প্রতিষ্ঠার প্রশিক্ষণ দিতে হবে। মসজিদে যখন নামাযে দাঁড়িয়ে যাবে তখন সকল মসজিদ এবং সমস্ত সড়কগুলি নামাযীতে ভরে যাওয়া উচিত।** কারণ মসজিদে সবার জায়গা হবে না। মনে হয় যদি সবাই বা-জামাত নামাযে দাঁড়ায় তবে সমস্ত সড়কগুলো ভরে যাবে। এত মানুষ ওখানে কোন মসজিদে কোনভাবেই জায়গা হবে না। মসজিদে আকসায় খুব বেশী হলে দু'হাজার লোকের জায়গা হতে পারে। জলসায় কমপক্ষে দশ হাজার নবদীক্ষিতরাই আছেন। তাছাড়া পুরানো আহমদীরা তো আছেই। সমগ্র কাদিয়ানই মসজিদে রূপ ধারণ করবে। আর এটাই হওয়া উচিত। নিজ নিজ কাপড় বিছিয়ে নিবেন রাস্তায়, গলিতে, এর সাথেও পরিছন্নতার সম্পর্ক রয়েছে।

আল্লাহ্ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে অনেক বার তাগিদ দিয়েছিলেন, বারবার নসিহত করেছিলেন, "আমার ঘরকে পরিষ্কার রাখবে।" সুতরাং সমস্ত কাদিয়ান আল্লাহ্র ঘরের রূপ ধারণ করতে যাচ্ছে। এই কারণে আমি পরিচ্ছন্নতার কথা বলার পরই নামাযের কথা বলছি। পরিচ্ছন্নতা একান্ত প্রয়োজন। যে কোন স্থানে কেউ যেন কাপড় বিছিয়ে নামায পড়ে নিতে পারে। কাপড় যেন ময়লা না হয়। অতএব গলি সড়ক সবগুলো ঝাড়ুদার দিয়ে পরিষ্কার করে পানি ছিটিয়ে বিভিন্ন উপায়ে সুন্দর ঝকঝকে করে রাখতে হবে।

অতপর জলসার প্রোগ্রাম শুনে বেশী উপকৃত হতে হবে। এটাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কাদিয়ান যারা আসবেন তারা বড় দূর-দূরান্ত ভ্রমণ করে আসবেন। অনেকে তিন-তিনটি দিন ভ্রমণ করে তারপর কাদিয়ানে পৌছাবেন। এ পর্যন্ত অনেকে পৌছে গেছেন। অনেকে পৌছে যাবেন শীঘ্রই। তাদের সবাইকে অভ্যাস করাতে হবে জলসার বক্তৃতামালা শোনার । প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত বক্তৃতা যেন তারা শোনেন।

শেষ কথা এবং প্রথম কথা হচ্ছে দোয়া। দোয়া ও যিকরে ইলাহীতে রত থাকার উপর জোর দিবেন। অভ্যাস করুন– চলতে চলতে, উঠতে বসতে দোয়া করুন যিক্‌রে ইলাহী করুন। কাদিয়ানের পরিবেশ এবং বায়ুমণ্ডল যেন যিকরে ইলাহীতে ভরে যায়। এবারে তকবীর তো উচ্চ কণ্ঠে বলা হয়ে থাকেই; কিন্তু আকাশে আরশের পায়া কাঁপানোর শক্তি রাখে হৃদয় থেকে উত্থিত যিকরে ইলাহী- নিঃশব্দেই হোক না কেন। অতএব, যিকরে ইলাহী সকলেই করবেন। কাদিয়ানের অধিবাসী হোন আর বহিরাগত হোন।

যেখানে দোয়ার কথা আছে সেখানে দাওয়ার প্রসংগও উঠবে, অর্থাৎ ঔষধের প্রয়োজন হবে। অনেকে গরম অঞ্চল থেকে আসবেন তাদের অধিকাংশ শীতে সর্দি-কাশি ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হতে পারেন। আজকাল ইনফ্লুয়েঞ্জারও বড় প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। এসবের প্রতিরোধ ও প্রতিষেধক হোমিও পদ্ধতিতে আমার অভিজ্ঞতায় ইনফ্লুয়েঞ্জিয়াম প্রস্তুত করা আছে। এটা আল্লাহ্র ফযলে বড় কার্যকর হতে পারে। সর্দি জাতীয় বিভিন্ন রোগে প্রতিষেধক হিসাবে আল্লাহ্র ফযলে খুবই কার্যকর পেয়েছি। সম্ভবতঃ ইতঃপূর্বেও এই নির্দেশ দিয়েছিলাম। এখন আবার তাগিদ করছি। প্রচুর পরিমাণে এ ঔষধ প্রস্তুত হয়ে সর্বত্র সহজলভ্য হয়ে যাওয়া চাই যেন আল্লাহ্র ফযলে রোগাক্রান্ত কেউ না হয়। একবার কেউ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে বহু কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। যদি আক্রান্ত না-ই হয় তবে তো বেশ ভাল।

এ কারণেও এ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ যে, হিন্দুস্থানে যক্ষা রোগটি খুব বেশী হয়ে থাকে। দরিদ্রতার কারণে মশার কামড়ের ফলে এমন আরো অনেক কারণ আছে যার ফলে রাতে যখন জ্বর ছেড়ে যায় তখন হঠাৎ করে ঠান্ডা লেগে যায়। প্রায় সময় ফুসফুসের আক্রমণ হয়ে যায়। ফুসফুসের অসুখের জন্য সর্দি লাগাটা মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে হাঁপানী রোগীদেরও কষ্ট বেড়ে যায়। সুতরাং আমার মতে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, দোয়ার সাথে সাথে দাওয়া বা ঔষধেরও ব্যবস্থা নিতে হবে। বিশেষ করে এমন ঔষধ যেগুলো প্রতিরোধ সৃষ্টিতে কাজ করে। আল্লাহ্ আপনাদের সহায় হউন। আগামী কাল ইনশাল্লাহ্ হিন্দুস্থানের সময় অনুসারে বিকেল তিনটায় এবং লন্ডন টাইম অনুসারে সকাল দশটায় উদ্বোধনী বক্তৃতা দেব। এখানেও স্থান স্বল্প হওয়ায় আপনারা অনেক লোক এখানে বসার সুযোগ পাবেন না। তবে এম.টি.এ-তে সমস্ত অনুষ্ঠান সম্প্রচার হবে। অতএব, আপনারা নিজ নিজ ঘরে বসে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা সম্পর্কে আজকে যে হাদীস শুনাতে চাচ্ছি তার প্রথম তিরমিযী কিতাবের বির্‌র ও সিলাহ্ থেকে সংগৃহীত। হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস বর্ণনা করেছেন যে, আঁ হযরত (সঃ) তাঁর নিজ নামাযে দোয়া করতেন, 'হে আমার আল্লাহ্! আমি আমার প্রত্যেক কাজে তোমার নিকট থেকে প্রতি পদে দৃঢ়তা প্রার্থনা করছি।"

আমার মনে হচ্ছে অনুবাদক নিজ থেকে অনুবাদ করেছেন "প্রত্যেক কাজে"– আসলে কি আছে দেখছি। আসলে আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, *"ইন্নী আস্‌য়ালুকাস্ সিবাতা ফিল আম্‌রে"*

এর অনুবাদ ঠিক হওয়া সত্ত্বেও বাক্যের মূল অর্থ সঠিক নয় এখানে "ফিল আমরে"– অর্থ পূর্ণ শরীয়ত তথা আল্লাহ্র সকল আদেশে।

অতএব, আঁ হযরত (সঃ)-এর দোয়া ও গভীর অর্থপূর্ণ হোত। হুযূর (সঃ) দোয়া করতেন, 'হে আল্লাহ্। আমি যেন তোমার আদেশের উপর দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে পারি। তুমি যাই আদেশ দাও না কেন। এবং শরীয়তে যে সকল আদেশ দেয়া হয়েছে– সবগুলোর উপর যেন

দৃঢ় পদক্ষেপ বা দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করতে পারি। তার পর, 'ওয়াল আযীমাতা। এবং হেদায়াতের উপর দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকি। শরীয়তের আদেশাবলী ছাড়াও অনেক হেদায়াত থাকত–, প্রত্যেক প্রকারের হেদায়াত শরীয়তের মধ্যে স্পষ্ট উল্লেখ আছে বা নেই কিন্তু তা হেদায়াত। কোন প্রকারের হেদায়াতের পার্থক্য করার সুযোগ আমার নেই। সকল হেদায়াতের উপর যেন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারি। পুণ্যের কাজকে এমনভাবে যেন ধরি যেন তা কখনও হাত ছাড়া হয়ে না যায়। "তারপর আমি তোমার অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে পারি এবং অতি উত্তমভাবে ইবাদত পালন করতে পারি।"

ওয়া আস্‌য়ালুকা শুকরা নি'মাতিকা ওয়া হুসনা ইবাদাতিকা'

তোমার অনুগ্রহসমূহের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে তথা শোকরগুজারী হতে পারি এবং উত্তম ইবাদত অর্থাৎ উত্তম ইবাদতের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে কৃতজ্ঞতা স্বীকার বা শুকরিয়া আদায় করা যায়। সারা জীবন আল্লাহ্‌র যত কৃপা ও করুণা বা অনুগ্রহ লাভ হয়েছে তার সারাংশ হচ্ছে-*"ইয়্যা কানা'বুদু ওয়াইয়্যা কানাস্‌তায়ীন"* – ঐ সমস্ত অনুগ্রহের জবাবে কৃতজ্ঞতা হবে আমরা যেন তোমার ইবাদত করি। কৃতজ্ঞতার প্রথম এবং শেষ পর্ব হবে ইবাদত। ইবাদত যদি আমরা করি তবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হবে আর যদি ইবাদত না করি তবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হবে না। সুতরাং দেখুন, হুযূর (সঃ)-এর দোয়া কেমন সুন্দর করে গোছানো যেমন মতির মালাতে সুন্দর করে যেমন মতির দানাগুলো গাঁথা থাকে। দোয়া করেছেন– "তোমার নিকট (হে আল্লাহ্‌!) তোমার সমস্ত নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করার এবং উত্তম ইবাদত করার সামর্থ্য লাভ করি।

তারপর দোয়া করেছেন, " আমি তোমার নিকট পবিত্র মন বা পবিত্র আত্মা এবং সত্যবাদী মুখ বা কণ্ঠ প্রার্থনা করি।" হুযূর (সঃ)-এর কথা খুব গভীর অর্থবহ আধ্যাত্মিক তত্ত্বসম্পন্ন কথা। সুন্দর কলঙ্কহীন পবিত্র মন এবং সত্যবাদী মুখ দান কর। পবিত্র মনতো এমন যা আল্লাহ্‌র আনুগত্যের নিবেদিত প্রাণ হয়ে আনুগত্যের পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। আলাহ্‌র প্রতি এতবেশী ঝুঁকে গেছে যে, অন্য কথায় তার চিন্তা-চেতনার মধ্যে অবাধ্যতা স্থান পায় না। তারপর যদি তার কথা এবং ভাষা সত্যবাদী হয় তবে পুরো বিষয় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। অনেকে আছে, যাদের পবিত্র মন, আত্মা লাভ করতে অল্প সময় ব্যয় হয়। অনেকেই আবার জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করে তারপরও পবিত্র আত্মা লাভ করত সক্ষম হয়। এরই মধ্যে তার নিজের মুখ থেকে বা ভাষা বা কণ্ঠ থেকে অতিরঞ্জিত বা অনেক অসত্য কথা বলার অভ্যাসও হয়ে যায়। এখন সদিচ্ছা সত্ত্বেও তার কণ্ঠ মাঝে-মধ্যে হোঁচট খেতে পারে। এই দু'টি জিনিস একে অপরের সমর্থক বা সহায়ক। পবিত্র আত্মা এমন হওয়া উচিত যে, মুখ যেন তার সাথে সামঞ্জস্য রাখে। মুখে যেন এমন কোন বাক্য ব্যক্ত না করে যা পবিত্র আত্মার পরিপন্থী। অর্থাৎ একটিও ভুল বাক্য যেন ব্যক্ত করা না হয়।

এই দোয়াটি একটি সম্পূর্ণ দোয়া, আমি জানি আপনাদের জন্য আরবীতে এটা মুখস্ত করা কঠিন হবে। অতএব বিষয়-বস্তুটি স্মরণ রাখুন। আমি পুনরাবৃত্তি করছি। যতদুর সম্ভব রমযান মাসে বার বার পাঠ করুন। " হে আল্লাহ্‌! তুমি যে সকল ধর্মীয় আদেশ-নিষেধ দিয়েছ তাতে যেন দৃঢ়পদে কায়েম থাকতে পারি। আমি যেন পা পিছলে কোন সময় ধর্মীয় বিধানের বাইরে না পড়ে যাই। ঐ সময় ধর্মীয় বিষয় যা তুমি শরীয়তের মধ্যে বর্ণনা করেছ আদেশ বা নিষেধ সকল ক্ষেত্রে আমাকে দৃঢ়পদে কায়েম থাকতে সামর্থ্য দান কর। হেদায়াতের প্রতিটি কথার উপর দৃঢ়পদে প্রতিষ্ঠিত হবার সংকল্প করছি। আমাকে সংকল্পে দৃঢ় হবার সামর্থ্য দান কর। হেদায়াতের যে কোন কথা আমি পাই না কেন আমি যেন তার উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে পারি। তোমার অনুগ্রহরাজির জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার এবং যথাযথ ইবাদতের শক্তি দান কর। অতি উত্তমভাবে সুন্দরভাবে তোমার ইবাদত করার তৌফীক দাও। এছাড়া পবিত্র আত্মা ও সত্যবাদী কণ্ঠ দান কর।"

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের এই দোয়া যদি কবুল হয়ে যায় তবে ইসলামের বিশ্ব বিজয় হয়ে যাবে। এ দোয়া জীবনের সমস্ত অবস্থার ওপর প্রভাবশীল। আমাদের জামাত আগামীতে সারা পৃথিবীতে যে আধ্যাত্মিক বিপ্লব সৃষ্টি করতে যাচ্ছে এই ক্ষেত্রে যদি আমরা সারাক্ষণ এ দোয়া দ্বারা সুসজ্জিত থাকি তবে আর কোন কিছুর দরকার হবে না। সমস্ত বিষয়ের সারাংশ এটা– আমি অনেকবার পড়ে দেখেছি। অনেক চিন্তা করে দেখেছি। আমি আশ্চর্য হয়ে যাই এত উত্তম দোয়া যে, আঁ হযরত (সঃ)-এর মধ্যে কোন সামান্য বিষয়ও বাদ দেন নি। আমাদের সকল প্রয়োজন এর মধ্যে বর্ণনা করে দিয়েছেন।

আর একটি হাদীস সুনান নাসায়ী "কিতাবুস সাহাব" (ভুলে যাওয়া) থেকে সংগৃহীত হয়েছে। হযরত মায়ায বিন জাবাল (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) আমার হাত ধরে, 'হে মায়ায! আমি তোমাকে ভালবাসি।" মায়ায বড়ই ভাগ্যবান ছিলেন, স্বয়ং রসূল (সঃ) তার হাত ধরে বলেন, 'আমি তোমাকে ভালবাসি'। মায়ায বল্‌লেন, " হে রসূলুল্লাহ্‌! আমিও আপনাকে ভালবাসি। তখন রসূলুল্লাহ্‌ বল্‌লেন, যদি তাই হয় তবে তুমি কোনও নামাযে এই দোয়া করা থেকে বিরত থেকো না *"রব্বি আয়িন্নী আলা যিকরিকা ওয়া শুক্‌রিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিক।"* এখানে আমি আরবীতে আসলে দোয়া পড়েছিলাম কারণ এটি বড় সহজে মুখস্ত করা যেতে পারে। আমি রাওয়াতে মসজিদে মোবারকে মসজিদে আকসায় অনেক মানুষকে এই দোয়া পড়তে শুনেছি। মায়াযও বললেন, হে রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) আমিও আপনাকে ভালবাসি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, অনেক সময় ছোট পদের মানুষ বড় পদের মানুষকে বলে যে, আমি আপনাকে ভালবাসি।" কখনও বড়রা ছোট শিশুদের এমন বলেন, তখন শিশুরাও বড়দের ঐ একই উত্তর দেয়। যেমন আমাদের হল্যান্ডের আমীর একবার আমাকে শুনালেন। মজাদার চুটকিও বলা যায় এটাকে। তিনি বললেন, 'একবার আমার ছেলে আমাকে বলল, "I Love you" অনেক শিশুরা এমন বলে। কখনও বাবা সন্তানকেও এরূপ বলেন। আমীর সাহেব ছেলের জবাবে বললেন I Love you too! আমিও তোমাকে ভালবাসি। ছেলে ভাল ইংরেজী জানত না সে বাবাকে উত্তর দিল I Love you three. ছেলে মনে করেছে too-এর অর্থ two সুতরাং সে উত্তরে বলেছিল যে, I love you three আমি তোমাকে তিনগুণ ভালবাসি"। এখানে হযরত রসূল করীম (সঃ) মা'য়াযকে বল্‌লেন, " আমি তোমাকে ভালবাসি। মা'য়ায উত্তরে বল্‌লেন, হে রসূল (সঃ) আমিও আপনাকে ভালবাসি। একথা শুনে আঁ হযরত (সঃ) তাকে শিখালেন, ভালবাসার প্রকৃত অর্থ কী? হযরত রসূল (সঃ) শিখাতে চাচ্ছিলেন। তাই তার মধ্যে ভালবাসা জাগাবার জন্য এমন বলেছিলেন যেন মা'য়াযও জানতে চান ভালবাসার অর্থ কী? এবার হুযূর (সঃ) বল্‌লেন, " আচ্ছা! তুমি আমাকে ভালবাস। তবে কোন নামাযে এই দোয়া পড়তে বিরত থাকবে না।

"হে আমার প্রভু! তোমার যিক্‌র করতে তোমার সাহায্য চাই, তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ হতে তোমার সাহায্য চাই। তোমার ইবাদতকে সুন্দর করতে তোমার সাহায্য চাই। রব্বি আইন্নি আলা যিক্‌রিকা

ওয়া শুকরিকা ওয়া হুস্‌নি ইবাদাতিক।" এবার দেখুন, (ভালবাসার জবাবে এই দোয়া) ভালবাসার সাথে এর কী সম্পর্ক? প্রকৃত সত্য এই যে, যার সাথে ভালবাসা হয় তার মতো হতে হয়। এটাতো এমন হতে পারে না যে, যাকে ভালবাসা হলো তার স্বভাব-চরিত্রের সাথে দূরত্ব সম্পর্কও নেই বা স্বভাব-চরিত্রের সাথে কোন মিলই নেই। যখন একজন মানুষ অপর একজনকে ভালবাসে তখন সে তার অনুরূপ হওয়ার জন্যে চেষ্টা করে। সুতরাং আঁ হযরত (সঃ) মা'য়ায (রাঃ)-কে ভালবাসার গভীর রহস্য বুঝালেন। আর তার মাধ্যমে অন্যেরাও নসিহত পেয়ে গেলেন যে, যদি তোমরা আমার সাথে অর্থাৎ রসূল (সঃ) বলেছেন, "যদি তোমরা আমাকে ভালবাস তবে তোমরা এ দোয়া করতে কখনো বিরত হবে না, **রব্বি আয়িন্নী আলা যিক্‌রিকা, ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা।"** অর্থ ঃ হে আমার আল্লাহ্! তোমার যিকর করতে আমাকে সাহায্য কর, তামার প্রতি কৃতজ্ঞ হতে আমাকে সাহায্য কর, নতুবা আমি যথাযথভাবে তোমার যিক্‌র করতে পারব না আর তোমার কৃতজ্ঞতা করতেও পারবনা । আর উত্তম ইবাদত এটি কৃতজ্ঞতা স্বীকারের উত্তম অবস্থা। অতএব ইবাদতের মধ্যে সৌন্দয্য সৃষ্টি করতে তুমি আমাকে সাহায্য কর।

এখন হযরত নু'মান বিন বশীর (রাঃ)-এর বর্ণনা মুসনদ আহমদ বিন হাম্বল থেকে নেয়া হয়েছে। হযরত নু'মন বিন বশীর বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূল (সঃ) বল্‌লেন, হুযূর (সঃ) তখন মিম্বারের উপরে দাঁড়িয়েছিলেন,

"যে ব্যক্তি অল্পে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে বেশীতেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।" দেখুন, মানব স্বভাবের কত গভীর রহস্যের বর্ণনা দিয়েছেন। কোন ব্যক্তিকে যদি সামান্য কিছু দেয়া হয় আর সে যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করে তবে তাকে অনেক বেশী দেওয়া হলেও সে কৃতজ্ঞ হবে না। এহ্‌সান (কৃপা) তো এহ্‌সান ই হয়। কোন ব্যক্তিকে যদি রাস্তা দেখিয়ে দেয়া হয়, সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। যদি কেউ কিছু চায় আর তুমি তাকে তা নিজের থেকে দিয়ে দাও তবে সে আরও বেশী কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। যদি তা খুব কম বা অল্পও হয়। যদি কেউ চায় আর তুমি তাকে দাও তা অল্প হলেও সে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে।

বিষয়টির সম্পর্ক দরিদ্র অথবা বিত্তবান হওয়ার সাথে নয়। প্রত্যেকটি মানুষের সাথে এর সম্পর্ক। যাদের স্বভাবে কৃতজ্ঞতা নেই, তাদের কোন কিছু বেশী দিলে হয়ত তারা দেখা যায় বাহ্যতঃ কৃতজ্ঞতা প্রকারশ করছে। কিন্তু পরীক্ষা হয় তখন, যখন অল্প দিয়ে দেখা যায় তারা কৃতজ্ঞ হচ্ছে কিনা। আমি কখনও কখনও ফকীরকেও দেখেছি অল্প দিলে তারা ফেলে দেয়। পয়সা দিলে নেয় না।

আজকাল পাকিস্তানে যদি কেউ কোন ফকীরকে পয়সা দেয়, দেখবে কেউ যেমন তার মুখে জুতা মেরেছে এমন ভাব। কেউ পয়সা দূরে ছুঁড়ে ফেলেও দেয়। বলবে, যাও মিয়া আজকাল টাকার দাম নেই তুমি পয়সা দিচ্ছ। এক টাকা দিলেও দেখবে সে নিবে না, ফেলে দিবে।

অতএব, কৃতজ্ঞতার পরিচয় অল্পে। দেখুন, রসূল (সঃ) কত বড় গভীর সত্য কথা বলেছেন, কৃতজ্ঞতার বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। সুতরাং আঁ হযরত (সঃ)-এর নিকট থেকে আমাদের কৃতজ্ঞতা শিখতে হবে যে, কৃতজ্ঞতা কী জিনিস। সুতরাং আঁ হযরত (সঃ) বল্‌লেন, যে অল্প পেয়ে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না, সে বেশী পেয়েও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবে না। প্রকৃত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করার প্রমাণ হলো কেউ অল্প পেয়েও কৃতজ্ঞ থাকে।

এখানে প্রসংগক্রমে আমার মনে হচ্ছে আর একটা কথা বলা দরকার। যদিও তা বাহ্যতঃ মূল বক্তব্য থেকে সরে যাবে, তবুও তা বলা প্রয়োজন। কেননা, এ বিষয়ে অনেকে পত্রে এমন কথা বলেন। তাদের বুঝানোর জন্য আমাকে একথাগুলো বলতেই হবে। ঐ কথা এই যে, অল্পে তুষ্ট হওয়া এবং মিতব্যয়িতা একই বিষয়ের দুই নাম। কারো হৃদয়ে যদি মিত্যব্যয়িতা বা স্বল্পে তুষ্ট হবার যোগ্যতা না থাকে সে কৃতজ্ঞ হতে পারবে না কখনও। যদি অন্তরে স্বল্পে তুষ্ট ও আনন্দিত হওয়ার মনোভাব থাকে তবে অল্পেও কৃতজ্ঞ হওয়ার মতো তার হৃদয়ে অবস্থা আল্লাহ্ সৃষ্টি করে দিবেন। একটি রুটি পেলেও সে কৃতজ্ঞতাভরে খাবে। শুক্‌নো রুটি পেলেও সে আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা করতে থাকে। আর যদি মিতব্যয়িতার অভ্যাস থাকে তবে ধনীদের বেশী ধন দেখেও তার অন্তরে জ্বালা সৃষ্টি হয় না। কৃতজ্ঞতা স্বীকারকারীদের আর একটা অদ্ভূত ব্যাপার এই যে, অন্যদের প্রতি আল্লাহ্‌র ফযলের প্রাচুর্য দেখে এদের মন খারাপ হয় না। তারা জানে যে, আল্লাহ্ সর্বাধিপতি যাকে বেশী দিতে চান দিয়ে দেন। যাকে কম দিতে চান তাকে কম দেন। সে অল্প পেয়েও সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু জামাতের কোন কোন ব্যক্তির পক্ষ থেকে এ ধরনের পত্র পাই যার উত্তর এই মুহূর্তে এই হাদীসের আলোকে এই খুতবার মাধ্যমে দিয়ে দিলাম।

বাহ্যতঃ ভাল কথাই লেখা থাকে। **জামাতের মধ্যে নসিহত করবেন যেন তারা বিয়ে-শাদীতে অপব্যয় বা অতিরিক্ত ব্যয় না করে।** একেবারে সত্য কথা বিয়ে-শাদীতে অতিরিক্ত টাকা খরচ করা উচিত নয়। কিন্তু আসলে যিনি লিখছেন তিনি চান যে, আল্লাহ্ যার প্রতি বেশী ফযল করেছেন সে-ও যেন ঐ রকম অল্প ব্যয় করে, যেমন কাউকে আল্লাহ্ সামর্থ্য দেনই না। তারা চান যে, যেমন কোন গরীব লোক, যার নিকট খরচের কিছুই নেই, তেমনই একজন ধনবান ব্যক্তিও যেন অল্প খরচ করেন যাতে গরীবদের তা দেখে অন্তরে জ্বালা সৃষ্টি না হয়। গরীবদের অন্তর-জ্বালার কথা বলে বস্তুতঃ তিনি নিজের অন্তরের জ্বালাকেই চিহ্নিত করেছেন। তার অন্তরে মিতব্যয়িতা নেই। ধনবানদের খরচ দেখে খুব ক্রোধ সৃষ্টি হয় যে, ধনবানরা খরচ করছেন, আর তিনি খরচ করতে পারছেন না। ফলে সারাক্ষণ তার অন্তরের জ্বালায় তিনি জ্বলতে থাকেন এবং আমাকে দিয়ে সমস্ত জামাতকে নসিহত করাতে চান যে, আল্লাহ্ তোমাদের বেশী দিয়েছেন, তোমরা তা লুকিয়ে রাখ, গরীবদের জন্য তা খরচ করবে না। আর খুশীর সময়ও বেশী খরচ করবে না।

এ প্রসংগে আমি আপনাদের নসিহত করতে চাই যে, **মুসলমানদের খুশীর মধ্যে অবশ্যই গরীবরা শামিল হবেন।** আঁ হযরত (সঃ) **এমন দাওয়াত (খাবারের নিমন্ত্রণ) সম্পর্কে অভিশাপ দিয়েছেন, বলেছেন, যে দাওয়াতে গরীবদের শামিল করা হয় না।** অতএব, আমাদের ধনবানরা যদি বিয়ে-শাদীতে বড় দাওয়াত না করেন যার মধ্যে বড় সংখ্যায় গরীবরা শামিল হয় তাতে কার ক্ষতি। এতো গরীবদের জন্যই ক্ষতির কারণ। আর এর জন্য কারো অন্তরের জ্বালার কারণে অন্যের ক্ষতি হবে এমন নসিহত তো আমি করব না। যদি এই শর্ত থাকে যে, তুলনামূলকভাবে সাদা-সিদাভাবে দাওয়াত হয় যেমন আহমদীদের বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে অনেক গরীব মানুষকেও দাওয়াত করা হয় তবে এমন খরচ তো কল্যাণমন্ডিত খরচ। কৃতজ্ঞতাস্বীকারের দায়িত্ব পালন করতে হবে। যখন কৃতজ্ঞতা পালনের দায়িত্ব পালন করতে হবে তখন আল্লাহ্‌র ফযলকেও তুলে

ধরতে হবে। এটাতো কুরআন শরীফে বর্ণিত হয়েছে। আঁ হযরত (সঃ) হাদীসেও বর্ণনা করেছেন। অতএব, অল্পের উপর যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হয় তবে অন্তরের জ্বালা সৃষ্টি হয় না। এটা মৌলিক বিষয় যা আপনাদের বুঝাতে চাচ্ছি।

আপনারা মিতব্যয়িতা অবলম্বন করুন। কার কাছে কি আছে, কত আছে, এ নিয়ে আপনার চিন্তার সুযোগ নেই। আপনাকে আল্লাহ্ যা দিয়েছেন তা নিয়ে আপনি সন্তুষ্ট থাকুন। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, অন্যদের কাছে কী আছে এই নিয়ে তিনি কষ্ট পান নি, আল্লাহ্ তাঁকে (আঃ) যা দিতেন তিনি (আঃ) তা আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে দিতেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকারের এটিও একটি উপায় যে, আল্লাহ্ যা দিয়েছেন তা আল্লাহ্‌র খাতিরে ব্যয় করে দেওয়া। সবটা তো আর ব্যয় করা যায় না। নিজের জন্যেও খরচ করতে হয়। তবে নিজের জন্য খরচের বেলায় কৃচ্ছ্রতা করে আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয়ের জন্য সচেষ্ট হওয়া যেতে পারে। তবে সবার জন্য হয়ত এতটা করা সম্ভব হবে না। প্রত্যেকের স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। মিতব্যয়িতার বিষয়টি অর্থাৎ আল্লাহ্ যা দিয়েছেন তা থেকে নিজের খুবই কম খরচ করা এতে আবার কৃত্রিমতা থাকা উচিত নয়। যদি স্বেচ্ছায় প্রণোদিত হয়ে নিজের জন্য অল্প ব্যয় করে আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করতে অভ্যাস করেন এবং এতে আপনি স্বস্তি বোধ করেন তবে খুব ভাল হয়। কিন্তু আল্লাহ্ যদি আপনাকে বেশী দিয়ে থাকেন এবং সে অনুযায়ী বেশী খরচ করেন তবে এটাও আল্লাহ্‌র ইচ্ছার বিপরীত নয়। এ সম্পর্কে আঁ হযরত (সঃ)-এর সমর্থন রয়েছে। পরবর্তী হাদীস যা আপনাদের শোনাব তাতে এর উল্লেখ আছে।

হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ) প্রথমে বল্‌লেন, যে ব্যক্তি স্বল্পে তুষ্ট এবং কৃতজ্ঞ নয় সে বেশী পেয়েও কৃতজ্ঞ হবে না। এর সাথে হুযূর পাক (সঃ) এর ফলাফল বর্ণনা করেছেন যে, যে-ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না সে আল্লাহ্‌র প্রতিও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। এই উভয় বাণীর মধ্যে সম্পর্ক কী? অর্থ এই যে, মানুষের থেকে তো সর্বদা অল্পই পাওয়া যায়– আল্লাহ্ থেকে অপরিসীম পাওয়া যায়। সুতরাং অল্পে যারা তুষ্ট নয় তারা বেশীতেও তুষ্ট নয়। তার পেটে এমন এক জাহান্নাম যা পৃথিবীর কিছু দিয়েই ভরা যাবে না। কত ছোট বা সামান্য কথাকে হুযূর (সঃ) কত বড় বিষয় বানিয়ে দিলেন। কথাটাকে হুযূর (সঃ) কত ব্যাপক করে দিলেন। অল্পে কৃতজ্ঞ হওয়ার অভ্যাস করো কারণ এর সম্পর্ক আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার দায়িত্ব পালনের সাথে। তুমি অল্পে কৃতজ্ঞ হবে তো আল্লাহ্‌র নেয়ামত বা অনুগ্রহরাজির কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হবে। তারপর হুযূর (সঃ) বলেছেন

"আত্‌তাহুদ্দুসু বি-নি'মাতিল্লাহি শুক্‌রুন ওয়া তারকুহা কুফ্‌রুন"

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নেয়ামত যা তোমাকে দেয়া হয়েছে তা প্রকাশ করা যে, আল্লাহ্ আমাকে দিয়েছেন, এমন করাও কৃতজ্ঞতা স্বীকার বটে। এখানেও বড় সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। অনেকে প্রকাশ করে যে, আমাকে দিয়েছেন এবং গরীবদের সামনে বসে বার বার বলেন যে, আল্লাহ্ আমাকে এত দিয়েছেন। কিন্তু সে ঐ গরীবদের কিছু দেয় না। সবকিছু নিজেই গুটিয়ে রাখে। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহরাজি নিয়ে বসে থাকে, বিতরণ করে না, তার এমনটি করা নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বীকার নয় বরং গরীবদের কষ্ট দেয়া। আল্লাহ্ তাকে অনেক দিয়েছেন বা যতটাই দিয়েছেন সে যদি ওগুলো প্রবাহমান রাখে তবেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার হবে। "তাহ্‌দীসেনেয়ামত" - 'নেয়ামতের প্রকাশ ও প্রচার'-এর প্রকৃত অর্থ এই যে, মুখেও নেয়ামতের কথা বলবেন এবং মানুষের সেবায় তা ব্যয় করবেন। তাদের দেখাবেন যে, দেখ, আমি কী পেয়েছি, শুধু গল্প করবেন না। যারা কেবল মুখে মুখে আলোচনা ও প্রচার করে তারা আসলে অহঙ্কারী মানুষ। তারা মানুষের মধ্যে নিজের ধন-সম্পদের গল্প করবে আর গরীবদের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি করবে।

অতএব, আঁ হযরত (সঃ) আল্লাহ্‌র নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা যে স্বীকার করতে বলেছেন তার অর্থ এই যে, "নেয়ামতের" কথা প্রকাশ না করা অকৃতজ্ঞ হওয়া। এখানে হুযূর (সঃ) বলেছেন, 'নেয়ামতের কথা প্রকাশ না করাতে অকৃতজ্ঞতা হয় এটাও বড় গুরুত্বপূর্ণ কথা। অনেকে গরীবদের থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য নিজেদের আয় প্রকাশ করে না। হুযূর পাক (সঃ) এ অর্থ করেছেন। তারা গরীবদের সাহায্য চাওয়া থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে নিজের সম্পদের কথা প্রকাশ করে না। জামাতের যারা চাঁদা সংগ্রহ করেন তাদের থেকে বাঁচার জন্য আয় প্রকাশ করে না। তাদের নিকট গেলে বলে, 'আমাদের নিকট তো কিছুই নেই।' অথচ সবার নযর পড়ছে যে, অনেক কিছু আছে। অথচ মাঝ খানে কিছুই নেই। কিন্তু প্রকৃত অর্থে কিছুই থাকে না তাদের, কারণ আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তার কোন মূল্য নেই। তারা সবসময় উলংগ, ক্ষুধার্ত, ভিক্ষুক-ই হয়ে থাকে। এমন অবস্থা নিয়ে পৃথিবীতে জীবন যাপন করে এবং এমন অবস্থা থেকেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে পরকালে চলে যায়।

আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ্‌র নেয়ামতের প্রকাশ না করা অকৃতজ্ঞতা। নেয়ামতের উল্লেখ কর মানুষের সামনে এই অর্থে যে, তুমি নিজেও সেই নেয়ামতের সুস্বাদ ও সুফল মানুষের মধ্যে বিতরণ কর। মানুষের সামনে আল্লাহ্‌র নিয়ামতের বর্ণনা করতে গিয়ে 'এই ভয় পেও না যে, আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচের জন্য আহ্বান এসে যাবে। সে আহ্বান জামাতের পক্ষ থেকে হোক বা কোন ফকীরের বা গরীবের পক্ষ থেকে হোক। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচের জন্য তোমাকে বলা হবে এই ভয়ে নিজের আয় গোপন কোর না। যদি এটা কেউ বুঝে নেন এবং পেয়ে যান তবে এটাও একটা বড় রহমত। যার ফলে সমগ্র জামাত একসূত্রে গ্রথিত হয়ে যাবে। কেননা, ধনীরা গরীবদের দিবেন। আল্লাহ্‌র যিক্‌র করবেন। ফলতঃ আল্লাহ্‌র যিক্‌রের সাথে আল্লাহ্‌র নেয়ামতের সুফল মানুষকে দিতে থাকবেন। জামাতকেও, যেহেতু এটি আল্লাহ্‌র জামাত, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জামাতকে দিবেন। জামাতকে বলবেন যে, আল্লাহ্ আমাকে এটাও দিয়েছেন সুতরাং আমি এটাও দিব, ওটাও দিবে। যদি আপনারা এমন করেন তবে এটা এমন কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হবে, যা হবে আল্লাহ্‌র রহমত।

এই কারণে আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, "জামাতই রহমত"-এখানে যে বল্‌লেন, "জামাতই রহমতস্বরূপ" এর অর্থ এই যে, যদি এমন কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর তবেই 'জামাত' হতে পারবে। যদি এমন না কর তবে 'জামাত' (কায়েম) হতে পারবে না। একত্রে থাকতে পারবে না। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। তারপর বলেছেন, "বিচ্ছিন্ন বা বিভেদ আযাবস্বরূপ"। সুতরাং যদি 'জামাত' না হও তবে আল্লাহ্‌র ক্রোধ এবং আযাবে নিপতিত হবে। পুরো বিষয়টা শোকরগুযারী বা আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা স্বীকারের বিষয়। হযরত নবী করীম (সঃ) কৃতজ্ঞতা সম্পর্কে যা বর্ণনা করেছেন, আমি এখন আপনাদের সামনে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে সবিস্তারে বলে দিলাম যেন আল্লাহ্‌র ফযলে আমাদের জামাত কৃতজ্ঞতা স্বীকারকারী জামাত হয়ে যায়।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে একটি হাদীস বর্ণীত আছে। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, আঁ হযরত (সঃ) থেকে শুনেছেন। হুযূর (সঃ) বলেছেন, এক ব্যক্তি রাস্তায় চলছিল। হুযূর (সঃ) একজন পথিকের কথা বলেছেন, পথিক যাচ্ছিল। সে কাঁটা বিশিষ্ট ডাল পড়ে আছে দেখে তা সরিয়ে দিল। আল্লাহ্ তার এই কাজে এত সন্তুষ্ট হলেন যে, তার সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দিলেন। এখন যার কাছে কিছু খরচ করার মত নেই সে রাস্তা থেকে কষ্টের জিনিস সরিয়ে ফেললে তার ক্ষমা হয়ে যায়। এর অর্থ এই যে, আপনি কখনও একবার রাস্তা থেকে ডাল পালা সরিয়ে ফেলেছেন অতএব, সারা জীবন আর কোন পুণ্য কর্মের প্রয়োজন নেই। আঁ হযরত (সঃ)-এর কথায় গভীর তাৎপর্য থাকে। সাধারণভাবে অর্থ করা যায় না। এমন একব্যক্তি যে গরীব তার খরচ করার মত কিছু নেই কিন্তু সে খেদমত করতে চায় কিন্তু সামর্থ্য নেই। এমন ব্যক্তি যদি কোন সময় এভাবে খেদমত করে যে, মানুষের কষ্ট হতে পারে এমন বস্তু সরিয়ে দিয়ে খেদমত করে। রাস্তায় কাঁটা সরিয়ে দেয়। এটা একটা খেদমত। রাস্তা থেকে কাঁটাযুক্ত ডাল-পালা সরিয়ে ফেল্‌লে যে কেউ খালি পায়ে হাঁটলে কাঁটা বিধার কষ্ট থেকে রক্ষা পাবে। এটা তার পক্ষ থেকে "সদকা" (পুণ্য) বলে গণ্য হবে। আল্লাহ্‌ও দয়াময়, তিনি তার এ খেদমতকে গ্রহণ করে নিলেন। কেননা, তার আকাঙ্ক্ষা ছিল মানুষের সেবা করার। এজন্যে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিলেন (তিরমিযী বাব- মা যা ফি এমতাতেল আয়া আনেন তারিকে)।

আপনাদের মধ্যে যারা জীবন উৎসর্গ করেছেন এখন যেমন হোমিওপ্যাথির বিষয়ে জামাতের মধ্যে বড় উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। বিনা টাকায় ঔষুধ নিয়ে অনেকের বাড়ী বাড়ী গিয়ে রুগী দেখে ঔষধ দিয়ে আসছেন। এটাকে সাধারণ ব্যাপার মনে করবেন না। এর দ্বারা মাগফেরাত (আল্লাহ্‌র ক্ষমা) পাওয়া সম্ভব। যারা আল্লাহ্‌র খাতিরে মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করতে সচেষ্ট, মনে রাখবেন আল্লাহ্ এদের ভুলেন না। কেননা, আল্লাহ্‌র শিক্ষা এই যে, স্বল্পে তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ হও। আল্লাহ্‌র সামনে তো মানুষের যত বড় প্রচেষ্টাই হোক তা অতি তুচ্ছ। এটা কী করে সম্ভব যে, তিনি বান্দাদের বলেছেন, 'স্বল্পে তুষ্ট হও, কৃতজ্ঞ হও' অথচ তিনি নিজে স্বল্পে তুষ্ট থাকবেন না। বান্দার সকল প্রচেষ্টা এবং খেদমত যেহেতু আল্লাহ্‌র সামনে খুবই তুচ্ছ, গণনার যোগ্য নয়। অতএব তিনি সামান্য খেদমত ও স্নেহ পরবশ হয়ে গ্রহণ করেন এবং পুরস্কার দেন (অর্থাৎ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন) এই কৃতজ্ঞতারই উদাহরণ, রাস্তা থেকে কাঁটা সরালেও আল্লাহ্ শুকরিয়া আদায় করেন তথা পুরস্কার দেন। আর একটি হাদীস ইবনে মাজাহ্ কিতাবুয্ যোহ্দ বাব আল্‌ওরা ওয়াত্ তাকওয়াহ্ থেকে সংগৃহীত। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একবার আঁ হযরত (সঃ) তাকে বলেছিলেন, হে আবূ হুরায়রাহ! তাকওয়া এবং পরহেয্‌গারী অবলম্বন কর, সবচেয়ে বড় ইবাদতকারী হয়ে যাবে। অর্থাৎ তাকওয়া ও ন্যায়পরায়ণতা থাকলেই ইবাদত বলে গণ্য হয়। যদি তাকওয়া না হয় তবে কিসের ইবাদত। **ইবাদতের প্রাণ তাকওয়া। তাকওয়া না হলে ইবাদত হতেই পারে না। অসম্ভব। মানুষের তাকওয়া যতটা সুগঠিত হবে ততটাই তার ইবাদতের মান উন্নত হবে।** অতএব হুযূর (সঃ) বলেছেন, তাকওয়াশীল হও, ন্যায়-পরায়ণ হও। তবে বড় ইবাদতকারীতে পরিণত হবে।

হযরত আবূ হুরায়রা কী করে বড় ইবাদতকারীতে পরিণত হতে পারতেন। সবচেয়ে বড় ইবাদতকারী তো হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ছিলেন স্বয়ং। হুযূর (সঃ)-এর তাকওয়া ছিল সর্বোচ্চ। তাকওয়ার শিখরে ছিলেন বলেই তো তিনি সবচেয়ে বড় ইবাদতকারী হয়েছেন। অতএব, যে ব্যক্তির তাকওয়ার মান সবচেয়ে উন্নত তার ইবাদতের মানও উন্নত। আঁ হযরত (সঃ) নিজের মান ও মর্যাদাকে জেনে শুনেও একথা বলেছেন। তিনি আপনা-আপনি এমন কথা বলেন নি। হুযূর (সঃ) স্বয়ং নিজেকে অনেক সময় গোপন রাখার জন্যও এমন কথা বলতেন। জনসাধারণকে আসল পয়গামও দেওয়া হলো, আর নিজের সর্বোচ্চ স্থানের কথাও বলা হল। এখানে দেখুন, আঁ হযরত (সঃ) নিশ্চয়ই নিজের উদাহরণ দিয়েছেন। নতুবা আবূ হুরায়রা কীভাবে পৃথিবীর সর্বোচ্চ মুত্তাকী হতে পারতেন? অথচ আঁ হযরত (সঃ) যিনি তাকওয়া এবং ইবাদতের সর্বোচ্চ ব্যক্তি সামনে দন্ডায়মান ছিলেন এবং কথা বলছিলেন।

তারপর বল্‌লেন মিতব্যয়িতা অবলম্বন কর যেন সবচেয়ে বড় কৃতজ্ঞতাস্বীকারকারী বলে গণ্য হও। এখানে ঐ বিষয় যা আমি আগে বলেছি যে, মিত্যব্যয়িতার সাথে কৃতজ্ঞতা স্বীকারের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। মিতব্যয়িতা অর্থ অল্পে তুষ্ট হওয়া। মিতব্যয়িতার মাধ্যমে পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী হতে পারেন। এখানেও আঁ হযরত (সঃ) ব্যতীত অন্য কারো মিত্যব্যয়িতার কথা নিশ্চয় হচ্ছে না। অসম্ভব। আঁ হযরত (সঃ) ব্যতীত পৃথিবীতে আর কেউ এমন সৃষ্টি হয় নি যিনি এমন মিত্যব্যয়িতা অবলম্বন করেছেন যার ফলে আল্লাহ্‌র সবচেয়ে বড় কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনকারী হয়েছেন। হুযূর (সঃ) আবূ হুরায়রাকে সম্বোধন করে নিজের উদাহরণের কথাই বলেছেন।

মিতব্যয়িতার বিষয়ে আঁ হযরত (সঃ)-এর জীবনের ঘটনাবলীর উপর যদি আপনারা বিবেচনা করেন তবে দেখবেন যে, আল্লাহ্‌তাআলা হুযূর (সঃ)-কে অপরিসীম নেয়ামত দান করেছিলেন। কিন্তু তিনি বড় সাহসিকতার সাথে বিতরণ করে দিয়েছিলেন, বড় কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনকারী হিসাবে। আর ঠিক এমনই হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) তাঁর প্রভু হুযূর পাক (সঃ)-এর নিকট থেকে শিখেছিলেন। এখন আপনারা কেউ যদি বিভিন্নভাবে বা কৃত্রিমভাবে চেষ্টাও করে দেখেন তবে হেরে যাবেন অথবা ভেংগেই পড়বেন। তবে যদি মিত্যব্যয়িতার বিষয়টা বুঝে খুব ভাল করে বুঝে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের চেষ্টা করে যেতে থাকেন তবে ধীরে ধীরে আপনারও সাহস বাড়বে এবং আল্লাহ্ আপনাকে যা দিয়েছেন এবং দিতে থাকবেন আপনি তার মধ্যে অন্যদেরকে শামিল করতে থাকবেন।

আঁ হযরত (সঃ) আরো বলেছেন, "তুমি নিজের জন্যে যা পসন্দ কর অন্যের জন্যেও তা পসন্দ করবে।" এটাতো হতে পারে না যে, তিনি মিত্যব্যায়ী হয়েছেন, কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনও করছেন আল্লাহ্‌র তারপর নিজের জন্য এক রকম পসন্দ করছেন, আর অন্যের জন্য অন্য রকম পসন্দ করছেন। এর মধ্যে সত্যতা প্রজ্ঞা শেখানো হচ্ছে-যার উপর খুব গভীরভাবে মনোনিবেশ করা দরকার। **ছেঁড়া-ফাঁটা কাপড় গরীবদের মধ্যে বিতরণ করে সদকা মনে করা ঠিক নয়। এমন খাবার গরীবদের খেতে দেয়া যা পচে দুর্গন্ধ হয়ে গেছে কখনও উচিত নয়। আর এটা সদকাও হবে না।** আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, " যা নিজের জন্য পসন্দ কর তা অন্যের জন্যও পসন্দ করবে" । যখন তুমি আল্লাহ্‌কে খুশী করতে গরীবদের মধ্যে কাপড় বিতরণ করতে চাও তখন তাদের জন্য এমন কাপড় নাও যা পড়তে তোমার লজ্জাবোধ হবে না। যদি পুরানো হয় তবুও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হবে এবং তা এতো পুরানো হবে না যা পরার মত নয় এবং ফেলে দেয়ার মত এবং নিজে পড়তে লজ্জা বোধ হয়। ব্যবহৃত কাপড় নিজে পড়তে দ্বিধা বোধ হয় না।

হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) একবার হযরত নবাব মুহাম্মদ আলী সাহেবের ব্যবহৃত কোট নিজে পরেছিলেন। কারণ নবাব সাহেব তা কারো জন্য পাঠিয়েছিলেন এই ইচ্ছা পোষণ করে যে, সে যেন নিজের প্রয়োজনে ঐ কোট পরে যদি তার পরতে সংকোচ বোধ না হয়। কেননা, তিনি মনে করেছিলেন যে, ঐ কোট তাঁর পরার অযোগ্য হয়ে গেছে। হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) একটি মহান শিক্ষা দেবার জন্য নিজে রেখে ছিলেন এবং পরে ছিলেন। হুযূর (আঃ)-এর উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তিনি (আঃ) নবাব সাহেবের গোপনীয়তা রক্ষা করলেন যে, এ কোট এখনও এত পুরান হয় নি যে, পরার অযোগ্য হয়ে গেছে তাই আমি পরছি। তারপর এখন আমার স্মরণ নেই যে, হুযূর (আঃ) কাউকে হয়ত দিয়েছিলেন যেন সে এমন মনে না করে যে, এটা পরার মত নয়। হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর ব্যবহৃত কাপড় ছেঁড়া হলেও তা অন্যের জন্য একটি অতি মহান নেয়ামত হতো।

বিষয়টি বুঝে নিবেন যে, পুরান কাপড় দিলে এমন কাপড় দেন যা এখনও পরার যোগ্য আছে। নতুন দিতে পারলে নতুন দিবেন। নতুন কিনতে পারলে নতুন কিনে উপহার দিবেন। উপহার দিতেও নিজের পসন্দকে স্মরণ রাখুন। পসন্দমত উপহার ক্রয় করে দিন। খাবার দিতে হলে পসন্দের খাবার দিন। কাপড় দিলেও পসন্দের কাপড় দিন, এটা কেন প্রয়োজন? মু'মিন হবার জন্য প্রয়োজন। যদি তুমি খাঁটি মু'মিন হতে চাও, আল্লাহ্‌র উপর ঈমান রাখ-আল্লাহ্‌র উপর ঈমানের এক অর্থ তাঁর উপর ভরসা করা এবং আস্থা রাখা। তাঁর নিরাপত্তায় আসা এবং এর জন্য এটাই উত্তম পথ যে, খাঁটী মু'মিন হিসেবে অপরকে নিজের প্রিয় জিনিস দান কর।

তারপর বলেছেন, তোমার পাড়া-প্রতিবেশীরা আছে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার কর। তবে খাঁটি মুসলমান বলে গণ্য তবে। অর্থাৎ পড়শীদের কাউকে কোনভাবেও কষ্ট দিও না। তোমার পক্ষ থেকে তারা যেন কোন কষ্ট না পায়। বরং তারা যেন তোমার দ্বারা নিরাপত্তা ও শান্তি পায়। **'মুসলিম' শব্দের এক অর্থ এই যে, যার পক্ষ থেকে মানুষ শান্তি পায়, নিরাপত্তাবোধ করে। যদি তোমার পড়শী তোমার থেকে নিরাপত্তা লাভ করে তবে সমস্ত পৃথিবী তোমার থেকে নিরাপত্তা লাভ করল। আর যদি তোমার পরশী তোমার থেকে নিরাপদ না হয় তবে পৃথিবীর কেউ তোমার থেকে নিরাপদ নয়।**

শেষ কথা হচ্ছে "বেশী হাসাহাসি করো না। বিশেষ করে অট্টহাসি, উচ্চ কণ্ঠে হাসবে না।" আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, বেশী বেশী সময় হাসতে থাকা অভ্যাসে পরিণত হওয়া ভাল নয়। প্রত্যেক কথায় প্রত্যেক বিষয়ে হাসি-ঠাট্টার অভ্যাস ভাল নায়। কখনও আল্লাহ্‌র স্মরণে চোখে পানি না আসলে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনোযোগী হওয়া যাবে না। কিন্তু যদি সববিষয়ে এভাবে হাসি-ঠাট্ট করতে থাক এতে এক সময় তোমার মন নষ্ট হয়ে যাবে। তোমার অন্তরের মধ্যে সজীবতা থাকবে না।

অতএব, আহমদী জামাত জীবন্ত হৃদয়বান মানুষের জামাত। তাদের অন্তর এভাবে জীবিত থাকে যেভাবে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) জীবিত থাকার শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ্ আমাদিগকে শক্তি দান করুন। কাদিয়ানের অধিবাসীরা যারা এই খুতবা শুনেছেন তারা স্মরণ রাখবেন যে, অনেক লোক আপনাদের মধ্যে গরীব আছে। তাদের আপনারা স্বল্পেতুষ্ট হতে কৃতজ্ঞ হতে শিক্ষা দিবেন। তাদের ভেতর জীবন্ত অন্তর সৃষ্টি করুন। ইনশাল্লাহ্ এই দশ হাজার (নওমোবায়েয়ীন) লক্ষ লক্ষ বরং কোটিতে পরিণত হবে। আল্লাহ্ আমাদিগকে শক্তি দিন।

অনুবাদ- **মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী**
সদর মুরব্বী

আহমদীয়াতের বিরোধিতায় নেতৃত্বদানকারী, মিথ্যা অপবাদদানকারী ও কুৎসা রটনাকারী লোকদের বিরুদ্ধে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুন ঃ

اَللّٰهُمَّ مَزِّقْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَ سَحِّقْهُمْ تَسْحِيْقًا

لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ

(আল্লাহুম্মা মাযযিকহুম কুল্লা মুমাযযাকিন ওয়া সাহ্‌হিকহুম তাস্‌হীকা। লা'নাতুল্লাহি 'আলাল কাযিবীন)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্ ! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল।
মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর
খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি রেস্তোরাঁ
রোড # ৪৫-৪৬ # ৩২এ গুলশান, ঢাকা-১২১২
ফোনঃ ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৫০

সূচনা রেন্ট-এ-কার
যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য
যোগাযোগ করুনঃ
সালমান
অস্থায়ী অফিস ঃ
৬৭৬/৩২ ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা, ঢাকা
ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯

তৌযীহে মরাম

(লক্ষ্য-বস্তুর বিশ্লেষণ)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)

(নবম কিস্তি)

আরেক জায়গায় আল্লাহ্‌তাআলা ফরমাইতেছেন ঃ স্মরণ কর সেই সময়ের কথা যখন আল্লাহ্ যিনি তোমার প্রভু (যাহার তুমি পূর্ণ-বিকাশ) ফিরিশ্‌তাদিগকে বলিলেন, আমি মাটি হইতে এক মানুষ পয়দা করিব, অতঃপর যখন আমি ইহাকে পরিপূর্ণ ও সুষমরূপ দিব এবং আমার আত্মা (রূহ) হইতে উহাতে ফুৎকার করিব তখন তোমরা উহার জন্য সেজদায় অবনত হইও ; অর্থাৎ কামাল এনকেসারির সাথে অর্থাৎ পরিপূর্ণ বিনয়ের সাথে তাহার খেদমতে মশগুল হইয়া যাও যেন তোমরা উহাকে সেজদা করিতেছ। অনন্তর সমস্ত ফিরিশ্‌তাগণ ইনসানে কামেলের সামনে সেজদায় অবনত হইল কিন্তু এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইল যে, সে-ই শয়তান। জানা থাকা উচিত যে, এই সেজদার হুকুম সেই সময় হয় নাই যখন হযরত আদমকে পয়দা করা হইল বরং ইহা আলাদাভাবে ফিরিশ্‌তাগণকে হুকুম করা হয়, যখন কোন ইনসান তাহার ইনসানীয়তের হাকীকী মরতবা পর্যন্ত পৌঁছে এবং মানবীয় গুণাবলীর সুষম বিকাশ তাহার মধ্যে ঘটে এবং খোদাতাআলার রূহ্ তাহার মধ্যে অবস্থান গ্রহণ করে তখন তোমরা সেই কামেলের সামনে সেজদায় অবনত হও অর্থাৎ আসমানী নূরসমূহ নিয়া তাহার উপরে অবতীর্ণ হও এবং তাহার উপরে সালাত পাঠাও । সুতরাং ইহা খোদাতাআলার সেই প্রাচীন বিধান যাহা খোদাতাআলা তাহার বরগুজিদা বান্দাদের সাথে জারী রাখিয়াছেন চিরকাল। যখন কোন জামানাতে কোন ব্যক্তি রূহানীয়তের পূর্ণতা লাভ করে এবং খোদাতাআলার রূহ্ তাহার মধ্যে আবাদ হইয়া যায় ; অর্থাৎ স্বীয় নফসকে ফানা করিয়া দিয়া বাকা বিল্লাহের দর্জা হাসেল করিয়া ফেলে, তখন এক বিশেষভাবে ফিরিশ্‌তাগণ তাহার উপর অবতীর্ণ হইতে থাকে ; যদিও সুলুকের প্রথম স্তরেও ফিরিশ্‌তাগণ তাহার সাহায্য এবং খেদমতে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু এই নুযূল বা অবতরণ এতটা পরিপূর্ণ এবং গুণগত মানে উন্নত হয় যে, ইহা সেজদাতুল্য হইয়া থাকে। সেজদা শব্দ ব্যবহারের ফলে আল্লাহ্ ইহাও জানাইলেন যে, ইনসানে-কামেল হইতে মালায়েক (ফিরিশ্‌তাগণ) শ্রেষ্ঠ নন। বরং শাহী খাদেমদের মত ইনসানে কামেলের সামনে সেজদাতে তাজীম সম্পন্ন করিতেছে। এমনিভাবে আল্লাহ্‌তাআলা সূরা শামসের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম ইশারার মাধ্যমে রূপকের ব্যবহার দ্বারা ইনসানে কামেলের মরতবা আকাশমালা ও পৃথিবীর সমস্ত সত্তাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ প্রতিপাদন করিয়াছেন। যেমন তিনি ফরমাইয়াছেনঃ- অর্থাৎ, "কসম সূর্যের এবং উহার রৌদ্রের ; এবং কসম চন্দ্রের যখন উহা সূর্যকে অনুসরণ করে। এবং কসম দিনের যখন উহা স্বীয় আলো প্রকাশ করে। এবং কসম রাত্রির যখন উহা সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়। এবং কসম জমীনের এবং তাঁহার যিনি উহাকে বিছাইয়াছেন। এবং কসম ইনসানের নফসের এবং তাঁহার যিনি তাহাকে সুষম বিকাশের দ্বারা কামালিয়ত হাসেলের ব্যবস্থা এনায়েত ফরমাইয়াছেন এবং এস্তেকামতের (রূহানীয়তের পথে দৃঢ়তের) দ্বারা সমস্ত কামালিয়ত হাসেলের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং কোন প্রকার কামালিয়ত হইতে তাহাকে বঞ্চিত করেন নাই। বরং সমস্ত কামালীয়ত যাহা উপরে উল্লেখিত কসমসমূহের মধ্যে একত্রিত করা হইয়াছে তাহা মানুষের মধ্যে (ইনসানে কামেলের মধ্যে) সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এইভাবে ইনসানে কামেলের নফ্‌স সূর্যের এবং উহার রৌদ্রের গুণাবলীও নিজের সত্তার মধ্যে ধারণ করে ; এবং চাঁদের যে গুণাবলী তাহাদেরও সন্নিবেশ ঘটায় নিজের মধ্যে অর্থাৎ সে অন্যের নিকট হইতে ফয়েজ (কল্যাণ) হাসেল (আহরণ) করিতে পারে ; এবং এক নূর হইতে ফায়দা হাসেল করিয়া নিজের মধ্যেও নূর গ্রহণ করিতে পারে ; এবং তাহার মধ্যে আলোকময় দিবসের গুণাবলীও বিদ্যমান আছে যেভাবে যাহারা মেহনত ও মজদুরী করে তাহারা দিবালোকে তাহাদের কাজ কারবার সঠিকভাবে সম্পন্ন করিতে পারে, তেমনিভাবে সত্যের যাহারা অনুসন্ধান করে এবং রূহানীয়তের পথের যাহারা পথিক তাহারা ইনসানে কামেলের অনুসরণ করিয়া তাহার আদর্শকে নমুনাস্বরূপ গ্রহণ করিয়া খুব সহজে এবং সরল সাবলীল উপায়ে স্ব স্ব ধর্মীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিতে পারে। সুতরাং সে দিবসের মত নিজের সত্তাকে পরিপূর্ণ ও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিতে পারে এবং দিবসের মত সমস্ত গুণাবলী নিজের মধ্যে একত্রিত করে।* (চলবে)

অনুবাদ- **ওবায়দুর রহমান ভুঁইয়া**

** পাদটীকা ঃ সূর্য আল্লাহ্‌তাআলার প্রভায় সাতশত ত্রিশ প্রকারের রূপ পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবীর উপরে নিজের প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে ; এবং প্রত্যেক প্রকারের রূপের কারণে তাহার একটি বিশেষ নাম দেওয়া যাইতে পারে - যেমন শনি, রবি, সোম এই সমস্ত নামসমূহে প্রকৃতপক্ষে সূর্যের বিভিন্ন বিশেষ প্রকারের বিকাশের প্রভাবসমূহকেই বুঝাইয়াছে। যখন এই সমস্ত বিভিন্ন প্রভাব ও বিকাশকে মনে রাখা হইবে না তখন সাধারণভাবে ইহাকে সূর্য নামে অভিহিত করা হইবে ; আর যখন সূর্যের বিভিন্ন প্রকার গুণের প্রভাব ও বিকাশের কথা স্মরণ করা হইবে তখন বলা হইবে বিভিন্ন নাম - যেমন রবি, সোম, মঙ্গল - কখনও বলা হইবে দিন, কখনও বলা হইবে রাত, কখনও ইহার নাম রাখা হইবে রবিবার, কখনও সোমবার। আবার কখনও ইহার নাম হইবে শ্রাবণ, কখনও ভাদ্র, কখনও আশ্বিন, কখনও কার্তিক। মোটকথা হইতেছে এই সবই সূর্যের নাম। তেমনিভাবে মানুষের নফসেরও বিভিন্ন অবস্থা ও প্রভাব বিভিন্ন প্রকার প্রকাশ ও বিকাশের কারণে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত হইয়াছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইহার বিভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে। কখনও নফসে যাকীয়া, কখনও নফসে আম্মারা, কখনও নফসে লাওওয়ামা, কখনও নফসে মুৎমাইন্নাহ্। মোটকথা হইতেছে মানুষের নফসেরও ততগুলিই নাম আছে যতগুলি নাম সূর্যের আছে, কিন্তু বিষয়টি দীর্ঘায়িত হওয়ার ভয়ে এখানেই ইহাকে সীমাবদ্ধ করা হইল।*

জুমুআর খুতবা

ইবাদতে ধৈর্যাবলম্বন

[সাইয়্যেদনা হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) প্রদত্ত ১৬ অক্টোবর ১৯৯৮ ইং, মসজিদ ফযল লন্ডন]

হুযূর (আইঃ) তাশাহ্হুদ, তাআওউয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সূরা আল্ বাকারার ৪৫ থেকে ৪৭ নং আয়াত তেলাওয়াত করেন।

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٤٥﴾

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٤٦﴾

الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿٤٧﴾

অর্থাৎ, তোমরা কি লোকদেরকে সৎকাজের উপদেশ দাও এবং নিজেদের ভুলে যাও, অথচ তোমরা কিতাব (তওরাত) আবৃত্তি কর? তবুও কি তোমরা বিবেক-বুদ্ধি খাটাবে না?

এবং তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর, এবং নিশ্চয় এটি বিনয়ীগণ ব্যতীত (অন্যদের জন্য) বড়ই কঠিন, যারা বিশ্বাস রাখে যে, নিশ্চয় তারা তাদের প্রভুর সংগে সাক্ষাৎ করবে এবং অবশ্যই তারা তাঁরই দিকে ফিরে যাবে।

অতঃপর হুযূর (আইঃ) বলেন, এ আয়াতগুলোর প্রথম আয়াতে বিশেষভাবে ইহুদী আলেমগণ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। **'আ তামুরুনান্নাসা বিল্ বির্‌বি ওয়া তানসাওনা আনফুসাকুম ওয়া আনতুম তাত্‌লুনাল কিতাব'** অর্থাৎ এখানে সাধারণ ইহুদীগণ সম্বোধিত নয়, বরং বিশেষভাবে ইহুদী আলেমগণ সম্বোধিত। কেননা, **'তাত্‌লুনাল কিতাব'** বাক্যটি বলে যে, ঐ সব ইহুদী যারা কিতাব পড়ত। সাধারণ ইহুদীগণ ঐসব কিতাব অধ্যয়নকারীদের থেকেই সাধারণতঃ হেদায়াত প্রার্থনা করত। এজন্য (এখানে) আহলে কিতাব-এর আলেমগণ সম্বোধিত, তবে তাদের যে বৈশিষ্ট্যাবলী বর্ণনা করা হয়েছে তা যখন যেকোন জাতির আলেমদের মধ্যে পরিলক্ষিত হবে তখন তারাও অনুরূপভাবে সম্বোধিত হবে। কুরআন করীম ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য অতীতকালের আলেমগণ অথবা জাতিসমূহের অবস্থাগুলো বর্ণনা করে এদের সাদৃশ্যের দিকে দৃষ্টি আর্কষণ করে। যখনই যে জাতির সঙ্গে তাদের সাদৃশ্য হবে তখন তারাই কুরআনের প্রতি সম্বোধিত হবে।

এ মন্তব্যের সাথে এখন আমি এ আয়াতগুলোর অনুবাদ এবং কিছু ব্যাখ্যা পেশ করছি। **"আ তামুরুনান্নাসা বিল্ বির্‌বি ওয়া তান্‌সাওনা আনফুসাকুম'** – হযরত ঈসা (আঃ) যখন ইহুদীদেরকে সংশোধনের জন্য এসেছিলেন তখন ইহুদী আলেমগণ ব্যাপকভাবে এই ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিলেন। তারা কিতাবের তেলাওয়াত করতেন কিন্তু নিজেদেরকে ভুলে যেতেন। অর্থাৎ তারা তেলাওয়াত করতেন এবং ঐ তেলাওয়াত থেকে মানুষের সামনে ভাল-মন্দ বিষয়ে যা কিছু বর্ণনা করতেন অনেক সময় তারা তাতে পরিবর্তনও সাধন করতেন। কিন্তু এখানে সেই পরিবর্তন সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়া হচ্ছে না। বরং বলা হচ্ছে যে, তারা কিতাব থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ যে তাকওয়ার বিষয়ে শিক্ষা দিচ্ছেন, পুণ্যকে সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে গ্রহণ এবং মন্দকে দৃঢ়তার সাথে পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিচ্ছেন, তা জেনেও বর্ণনা করার সময় তারা নিজেদেরকে ভুলে যেতেন। নিজেদেরকে ভুলে যাওয়ার-দু'টি অর্থ রয়েছে। প্রথমত: এই উপদেশের উপর নিজেদের আমল ছিল না, তারা খারাপ চরিত্রের অধিকারী ছিল। মানুষের সামনে পুণ্য বর্ণনা করত কিন্তু নিজেদের অবস্থার প্রতি কখনও দৃষ্টি দিত না যে, তারা নিজেরা ঐ পুণ্যের উপর আমল করছে কিনা। **'আনফুসাহুম'** এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, নিকটতম আত্মীয়-স্বজন। নিজেদের নিকটতম ব্যক্তি যারা তাদের সংগে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখত তাদের বেলায় চোখ বন্ধ করে রাখত। তারা যে অবস্থায় যে ক্রাজ করত তা-ই তাদের ভালো লাগত। তাদেরকে বিশেষ করে পুণ্যের আদেশ দিতো না এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখত না। এ উভয় অর্থই এ আয়াতে করীমায় অন্তর্নিহিত রয়েছে। **'আ তামরুন্নানাসা বিল্ বির্‌বি'**– সাধারণ মানুষকে তো তোমরা পুণ্যের আদেশ দাও। **'ওয়া তান্‌সাওনা আনফুসাকুম'** – কিন্তু নিজেদেরকে এবং নিকটতম আত্মীয়দেরকে ভুলে যাও! **'ওয়া আনতুম তাতলুনাল কিতাব'**- এর অর্থ হচ্ছে, সাবধান! তোমরা জান যে, যে-অবস্থায় তোমরা নিপতিত, সেটা কিতাব অগ্রাহ্য করছে। জেনে শুনে এমন করছ। **'আফালা তা'কিলুন'**– তোমরা কি বিবেক খাটাবে না?

পরের আয়াতটি সাধারণভাবে সমস্ত মানব জাতিকে এবং বিশেষ করে মুসলমানদের সম্বোধন করছে। **'ওয়াসতাইনু বিস্‌সাব্‌রি ওয়াস্‌সালাত'**– এবং সাহায্য প্রার্থনা কর সবরের (ধৈর্যের) মাধ্যমে। **বিস্‌সাব্‌রি ওয়াস্‌সালাত'**-এর একই সংগে দু'টি অর্থ বিদ্যমান রয়েছে। বি-এর একটি অর্থ হল সবরের এবং নামাযের জন্য দোয়া চাও। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে সবরের এবং নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। অনুবাদকেরা সাধারণতঃ দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করে থাকেন। অথচ একই সঙ্গে দু'টি অর্থই প্রযোজ্য। একটি অপরটির সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করছে। সবরের জন্য সাহায্য চাওয়া এবং সবরের মাধ্যমে সাহায্য চাওয়া এ দু'টি বিষয় পরস্পরের সম্পূরক। যদি সবরের জন্য দোয়া চাওয়া হয় আর সবরের মাধ্যমে না চাওয়া হয় তাহলে সেই দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। অর্থাৎ কতক সময় দোয়া তাড়াতাড়ি কবুল হয়ে থাকে আর কতক সময় মানুষের পরীক্ষাও হয়ে থাকে। সেজন্য যদি কোন ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে খোদাতাআলার নিকট থেকে কোন বিষয় পাওয়ার সঙ্কল্প রাখে তাহলে তার উচিত সে যেন সেটিকে আঁকড়ে ধরে। এ বিষয়টিই 'বিস্‌সাব্‌রির' মধ্যে রয়েছে। সবর অবলম্বন কর আর যে পুণ্যের দোয়া তুমি করছ যদি তাতে তুমি সঠিক হয়ে থাক, সেটিকে পসন্দ করে থাক তবে সব সময় সেই পুণ্যের দোয়া জারী রাখ্। কেননা, সেটিত কখনও অপ্রয়োজনীয় হয় না। পুণ্যের প্রয়োজন জীবন ব্যাপীই থাকে। সুতরাং পুণ্যে সবর অবলম্বন করা আর পুণ্যে সবর পাওয়ার জন্য ওয়াদাতে সবর অবলম্বন করা যে, আল্লাহ্ আমাদেরকে পুণ্য দান কর–এটি একটি বিষয়েরই দু'টি অর্থ। একটি অর্থে দু'টি বিষয়।

'ওয়াস্ সালাত' এবং নামাযের ব্যাপারেও সবরের নির্দেশই প্রত্যাবর্তিত হয়ে থাকে। সুতরাং আমরা যারা নামায পড়ার চেষ্টা করি পুণ্যকে দৃঢ়তার সংগে অবলম্বন করতে চেষ্টা করি তাদের জন্য এতে দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক। যতক্ষণ পর্যন্ত আন্তরিকতার সাথে দোয়া জারী রাখব না ততক্ষণ এটি সম্ভব হবে না। এই দোয়ার কারণ উল্লেখ করে বলেছেন, **'ওয়া ইন্নাহা লা কাবিরাতুন ইল্লা আলাল্ খশিঈন।'** অর্থাৎ এ পুণ্য যে, নামাযে সবর করা, সবরের মাধ্যমে নামায পড়া আর নামযের মাধ্যমে দোয়া করা এগুলো **'ইন্নাহা লা কাবিরাতুন'**– বড়ই কঠিন ব্যাপার, বড় কষ্টকর কাজ। **'ইল্লা 'আলাল খশিঈন'**- তবে ঐ সব ব্যক্তি ব্যতীত যারা খুশূ (বিনয়) অবলম্বন করে। কুরআন করীমের আয়াতে করীমার প্রথম অংশ দ্বিতীয়টির, দ্বিতীয় অংশ প্রথম অংশটির ব্যাখ্যা করে। এ দু'টির পরস্পর স্থায়ী সম্পর্ক রয়েছে।

ইন্নাহা লা কাবিরাতুন ইল্লা 'আলাল খশিঈন'-এর মধ্যে খুশূর কারণ পরবর্তী আয়াত **'আল্লাযীনা ইয়াযুন্নুনা আন্নাহুম মুলাকু রব্বিহিম'**-এর বর্ণনা করা হয়েছে যে, **'খশিঈন'**-দের জন্য সবর এবং নামায কোনটি দুঃসাধ্য নয়। তবে **'খশিঈন'** কারা? **'আল্লাযিনা ইয়াযুন্নুনা আন্নাহুম মুলাকু রব্বিহিম'**– যারা এ ধারণা করে যে, তারা তাদের প্রতিপালকের সংগে অবশ্যই সাক্ষাৎ করবে। **'ওয়া আন্নাহুম ইলায়হি রাজিউন'**– এবং অবশ্যই তারা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। আমি এখানে **"ইয়াযুন্নুন"**– এর অর্থ করেছি 'ধারণা' অথচ অভিধানগুলো কুরআন করীমের এ আয়াত থেকে এর অর্থ বর্ণনা করেছে বিশ্বাস। মুসলমান ভাষাবিদগণের স্বীকৃত অনুবাদ থেকে আমি কোন্ অর্থে ব্যতিক্রম করেছি তা আপনাদের বুঝাতে চাই। কুরআন করীম অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আবরদের মাঝে কতক বাগ্‌ধারা প্রচলিত ছিল। 'যান' শব্দটির সাধারণ ধারায় আশা-ভরসার অর্থে ব্যবহৃত হয় বিশ্বাসের অর্থে নয়। কিন্তু আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসীরা জানতেন তারা অবশ্যই খোদার সমীপে হাজির হবেন। এজন্য তারা আল্লাহ্‌র সমীপে পেশ হওয়ার উপর বিশ্বাস রাখতেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বাস আবশ্যক এবং বাধ্যতামূলক। আল্লাহ্‌র সমীপে পেশ হওয়া আর লেকা (সাক্ষাৎ) ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। লেকা'-এর একটি অর্থ হচ্ছে তাঁর দরবারে আমাদের স্থান হবে, আমরা তার সংগে সাক্ষাৎ করব এ দু'টি সমর্থক নয় বরং লেকা এ অর্থ বহন কর যে, তারা আশা রাখে যে, তিনি আমাদের উপর ভালোবাসার দৃষ্টি রাখবেন। আমরা এভাবে 'লেকা বারিতাআলা' অর্জন করব। যেভাবে বাদশাহ্ তাঁর দরবারে প্রবেশের জন্য কাউকে অনুমতি দিয়ে দেয়। 'লেকা'-র দু'টি অর্থ রয়েছে যা স্মরণ রাখা উচিত, কতককে উপস্থিত হওয়ার জন্য ডাকা হয়ে থাকে যেন তাদের হিসাব-নিকাশ হয়। এটিকে ঐ অর্থে 'লেকা' বলা সম্ভব নয়, যে অর্থে ভালোবাসা এবং সম্মান রয়েছে। আরেকটি 'লেকা' রয়েছে যাতে ভালোবাসার উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎ হয়ে থাকে। অর্থাৎ 'লেকা-র অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্ সাক্ষাৎ দেন এবং তাদের ভালোবাসা প্রদান করেন। এটি হচ্ছে কারণ যে, **ইয়াযুন্নুন** শব্দ আমার দৃষ্টিতে তাই যা 'যন' (ধারণা)- এর অর্থ বহন করে। এটিতে একটি হিকমত রয়েছে। মু'মিন কর্মের দিক থেকে কখনও বিশ্বাস রাখে না যে, সে অবশ্যই তুষ্টি পাবে। তারা নিজেদের আত্মাকে চিনে, নিজেদের দুর্বলতা জানে। যত বড় আল্লাহ্‌ওয়ালা হবে তত বেশী বিনয় তার মধ্যে পাওয়া যাবে। এ জন্যে তারা 'লেকা'-এর অনেক খায়েশ তো পোষণ করে আর ধারণা করে যে, আল্লাহ্ আমাদেরকে 'লেকা-র সুযোগ দিবেন। 'ইয়াকিন' (বিশ্বাস)-এ এক ধরনের গর্ব এবং অহংকারের সৃষ্টি হয়ে থাকে যে, আমরা এত উপরে আছি তাই কীভাবে সম্ভব যে, আল্লাহ্ আমাদরকে 'লেকা' দান করবেন না? এ অর্থে তারা খোদার সংগে সাক্ষাতের যে বিশ্বাস রাখেন তা অসম্ভব। হযরত আকদস মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) থেকে বড় খোদা-প্রেমিক আর কেউ ছিল না। তিনি নিজের নাজাতের ব্যাপারে বলেছেন যে, আল্লাহ্‌র ফযলেই আমি মুক্তি পাব। এটি বিনয়ের শীর্ষ বিন্দু। এ কারণে এখানে 'ইয়াকীন' (বিশ্বাস) শব্দের ব্যবহার সম্ভব নয়। অনেকে আশা- আকাঙ্ক্ষা এবং খায়েশ প্রকাশ করে। আর এ অর্থেই যন (ধারণা)। তবে বিশ্বাসের সংগে বলতে পারে না যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ্‌তাআলা অবশ্যই আমাদের ডাকবেন। তারা কারা যারা এই বিশ্বাস রাখতে পারে যে, আল্লাহ অবশ্যই আমাদের ডাকবেন?

'আল্লাযীনা ইয়াযুন্নুনা আন্নাহুম মুলাকু রব্বিহিম ওয়া আন্নাহুম ইলায়হি রাজিউন'–যাদের বিশ্বাস রয়েছে যে, তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে কিন্তু এটি আবশ্যক নয় যে, লেকা-র দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যাবর্তিত হবে। অর্থাৎ প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার সাক্ষাতের দৃষ্টিকোণ থেকে সাক্ষাৎ হবে। সে তো তাঁর ইচ্ছা। তবে প্রত্যাবর্তিত হওয়ায় তারা অবশ্যই বিশ্বাস রাখে। এ বিশ্বাসের কারণে 'খশিয়াত' (বিনয়) সৃষ্টি হয়ে থাকে। লেকা-এর উন্নত দৃষ্টিকোণ থেকে নয় বরং (খোদার দরবারে) উপস্থিত হবার দৃষ্টিকোণ থেকে। অর্থাৎ আমরা অবশ্যই উপস্থিত হব। তাদের হৃদয়ে অনেক বিনয় সৃষ্টি হয়। তারা ভয় পেতে থাকে, এবং তাঁরা রাস্তায় বিলীন হতে থাকে এই বলে যে, তাদের হিসাব যেন সহজ হয়ে যায়।

এ আয়াতে করীমাগুলোর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ব্যাখ্যা হযরত আকদস মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বিভিন্ন উদ্ধৃতিতে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ বিভিন্ন গ্রন্থ ও মলফুযাতে তিনি বর্ণনা করেছেন যার মধ্য থেকে কতক উদ্ধৃতি নেয়া হয়েছে। প্রথম উদ্ধৃতি 'যমীমা বারাহীনে আহমদীয়া' থেকে গৃহীত খুশূ (বিনয়)-এর অবস্থা সেই সময় পর্যন্ত বিপদমুক্ত নয় যতক্ষণ পর্যন্ত বার বার রহমকারী খোদার সংগে সম্পর্ক কায়েম না হয়ে যায়।" হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর লেখার ব্যাপারে আমি বারংবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি যে, এগুলো অনেক সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পড়া উচিত। রহমানের (না চাইতে দান করেন) সাথে সম্পর্কের কথা এমনিতে হৃদয়ে এসে থাকে। এক সাধারণ ব্যক্তি এটাই মনে করবে যে, রহীম শব্দ নয় বরং রহমান শব্দ হওয়া উচিত। খুশূ এর অবস্থা সেই সময় পর্যন্ত মুক্ত নয় যতক্ষণ পর্যন্ত না রহীম (বার বার দয়াকরী) খোদার সংগে সম্পর্ক কায়েম হয়।" "রহমান যা প্রথমোক্ত গুণ, যা সৃষ্টির সংগে সম্পর্কের দিক দিয়ে বেশি বর্ণিত। এটিকে ছেড়ে রহীম গুণটি বেছে নেয়ার মধ্যে গভীর তাৎপর্য রয়েছে, যা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) নিজে বর্ণনা করেছেন। রহীম খোদা কর্মের ফল দিয়ে থাকেন এবং মন্দ কর্মের মন্দ ফল। তথাপি রহীমে যেহেতু রহমের বিষয় রয়েছে এজন্য এটি সম্ভব যে, পুণ্য কর্মের অত্যধিক প্রতিদান দিবেন। তবে যেহেতু রহীমের মধ্যে আমলের সাধারণ প্রতিদানের মর্ম রয়েছে এজন্য মন্দ কর্মের ততটুকুই প্রতিদান দিবেন যতটুকু সেই মন্দ কর্মে রয়েছে। মন্দের ততটুকুই শাস্তি প্রাপ্য হবে যতটুকু মন্দ তার থাকবে। আর এটি রহীমিয়তের কারণে হবে। আমরা এ পৃথিবীতে হিসাব নিকাশের যে প্রক্রিয়া দেখে থাকি তার সমস্ত ব্যবস্থাপনা রহীমিয়তের সংগে সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলছেন, "স্মরণ রাখা উচিত যে, যদি খোদাতাআলার কোন কৃপা কর্মবিহীন হয়ে থাকে তাহলে সেটি রহমানীয়তের গুণে হয়। রহমানীয়তের কর্মের সাথে প্রতিদানের কোন সম্পর্ক নেই। যখন মানুষের অস্তিত্বই ছিল না সেই সময় রহমান খোদা তাকে সৃষ্টি করেছেন, যখন কোন আবেদনকারী ছিল না তখন সমস্ত আবশ্যকীয় নেয়ামত তাকে দান

করেছেন। এরপর যদি কেউ রহমানীয়তের সম্পর্ককে কায়েম রাখতে চায় তাহলে রহীমিয়তের গুণকে সমুন্নত রাখা ছাড়া তা সম্ভব নয়। "যদি খোদাতাআলার কোন কৃপা কর্মবিহীন হয়ে থাকে তাহলে সেটি রহমানীয়তের গুণে হয়"। যেমন খোদাতাআলা মানুষের জন্য আসমান যমীন এবং যা কিছু সৃষ্টি করেছেন অথবা স্বয়ং মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এগুলো সব রহমানীয়তের কল্যাণে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু যখন কোন কল্যাণ ইবাদত, কর্ম-প্রচেষ্টা এবং সাধনার বিনিময়ে হয়ে থাকে সেটিকে রহীমিয়তের কল্যাণ বলা হয়ে থাকে। যে খোদা থেকে এসেছে সেই খোদার দিকে প্রত্যাবর্তনের সফর শুরু হয়ে যায়। রহমানীয়তের সম্পর্ককে ভুলে এ পৃথিবীতে তাঁর থেকে অনেক দূরে সরে যায়। অতঃপর যখন তাঁর দিকে ফিরে আসা আরম্ভ হয় তা তেমনি যেমন পাহাড় থেকে নিচে নামার পর পুনরায় উঁচুতে আরোহণ শুরু করলে হয়ে থাকে। প্রথমে পাহাড়ের শৃঙ্গে যে উচ্চতায় অধিষ্ঠিত ছিল তা আল্লাহর ফযলে ছিল। কোন সাধারণ স্বভাব শক্তি ছিল না। সেই উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে, যা রহমানীয়তের সংগে মানুষের পরিচয় করায়। মানুষ ক্রমান্বয়ে নিচে যাচ্ছে। রহমানীয়ত থেকে সফর শুরু করে সর্বশেষে এমন গর্তে পড়ে যায় যা থেকে আর নিচে যাওয়া যায় না। অতঃপর ঐ সকল ব্যক্তি যাদের উচ্চ শৃঙ্গ দৃষ্টিতে আসে আর তা মনোরম এবং ভাল লাগে তাদের হৃদয়ে ঐ শৃঙ্গের দিকে ফিরে যাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হবে। এটি হচ্ছে দুষ্কর এবং কষ্টকর সফর। এতে ধৈর্য এবং নামাযের মাধ্যমে প্রার্থনা করা আবশ্যক নতুবা সেসব ব্যক্তি যাদের এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতা রয়েছে তারা জানে যে, এমন সফরে কেউ কোথাও দাঁড়িয়ে যায় আর এইভাবে অপেক্ষা করতে থাকে যে, শীর্ষ জয় করে ফেলেছি। অথচ এর উপর আরও উচ্চতা অবশিষ্ট আছে। শীর্ষ জয় করে করে মানুষ মনে করে এখন আমি ঐ জায়গায় পৌঁছে গেছি যা সব থেকে উঁচু, তথাপি তার পরও অন্য আরও শীর্ষ দেখে। অনেক সময় জাগতিক পাহাড়ের চূড়া এক জায়গায় গিয়ে শেষ হয়ে যায়, যেমন হিমালয় পাহাড়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেষ্ট। মানুষ সেখানে পৌঁছে এ কথা বলতে পারে যে, আমি সব কিছু পেয়ে গিয়েছি। কিন্তু আল্লাহ্তাআলার রহমানীয়তের যে নির্দেশিকা রয়েছে তার চূড়া কল্পনাও করা যেতে পারে না যার দিকে আমাদের যেতে হবে। জাগতিকভাবে হিমালয়ের চূড়ায় যেতে মানুষ নিজেকে অত্যধিক কষ্টে নিপতিত করে, বিভিন্ন ধরনের অসুবিধা এবং বিপদ সহ্য করে। পা পিছলে গেলে উর্ধারোহণের পরিবর্তে অধঃপতন তার ভাগ্যে জোটে। যা থেকে কখনও বের হওয়া সম্ভব নয় অর্থাৎ মৃত্যু ঘটে। এ সমস্ত বিষয়াবলী আপনাদের জন্য রহমানীয়ত এবং রহীমিয়তের তুলনাকে পরিষ্কার করে। এ তুলনাকেই হযরত আকদস মসীহ মাওউদ (আঃ) ঐ লিখাটিতে বর্ণনা করেছেন ঃ "যা কিছু খোদা মানুষের জন্য আসমান যমীনে সৃষ্টি করেছেন অথবা স্বয়ং মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এগুলো রহমানীয়তের কল্যাণে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু যখন কোন কল্যাণ ইবাদত, কর্ম-প্রচেষ্টা এবং সাধনার বিনিময়ে হয় তখন সেটিকে রহীমিয়তের কল্যাণ বলা হয়ে থাকে। আল্লাহ্র এ সুন্নতই (রীতি) আদম সন্তানের জন্য জারী আছে।" অর্থাৎ কোন আদম সন্তান এর ব্যতিক্রম নয়। যখন মানুষ নামায এবং আল্লাহর স্মরণে খুশূ অবলম্বন করে তখন তিনি তাকে নিজ রহীমিয়তের কল্যাণের জন্য তৈরী করেন। খুশূ সম্পর্কে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) কিছু সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন যা আমি আপনাদের সম্মুখে বর্ণনা করব। কেননা, 'খুশূ'-এর বিষয়টি বুঝার জন্য কোমলতা অনেক সময় অসুবিধা সৃষ্টি করে। ঘটনাগুলো জাগতিক বা ধর্মীয় যা-ই হোক না কেন আপনি যথা আল্লাহ্তাআলার বান্দাদের সঙ্গে এভাবে আচরণ করেন যা নিজের জায়গায় বেদনা ভরা হয়। অথবা হযরত আকদস মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-কে এমন স্মরণ করেন, যার ফলে পড়ে স্বতস্ফূর্তভাবে অশ্রু প্রবাহিত হয়। বর্ণনা করার সময় আরও অসুবিধা হয়। পড়ার সময় মানুষ কিছুটা সামলাতে পারে কিন্তু যখন ঐ ঘটনাগুলো বর্ণনা করে তখন খুবই অসুবিধা হয়ে থাকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ঐ অশ্রু যা একটি ভয়ানক ঘটনার কারণে প্রবাহিত হয় তা কি খশিয়াতের নির্দশন? একে কি খুশূ (বিনয়) ও খুযূ (নম্রতা)-এর নিদর্শন ভাবা যেতে পারে? এ বিষয়টি অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং গভীরভাবে যাচাই করার বিষয় হয়রত মসীহ মাওউদ (আঃ) এ বিষয়কে সাধারণ মানুষ এবং পন্ডিতদের জন্য এমন সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন যে, এটি সহজে বোধগম্য। এর মধ্যে কোন সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কতক মানুষ জানে যে, যে গল্প পড়ছে তা ভয়ংকর। অনেক সময় মানুষ ঐ গল্প পড়ে ব্যাকুল হয়ে কাঁদে। অনেক শিশু যখন ভয়ংকর গল্প পড়ে তখন এত কাঁদে যে, বই হাত থেকে পড়ে যায়। আর ক্রন্দনরত অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ে। আপনি একে খুশূ ও খুযূ বলতে পারেন না। যদিও খুশূ এবং খুযূ এর অনুরূপই অর্থ তথাপি এটি খুশূ এবং খুযূ নয়। এর ফলশ্রুতিতে তাদের কোন প্রতিদান বা শান্তি দেয়া হবে না। বস্তুতঃ এটি আত্মার একটি অবস্থা যার কারণে আনন্দ অনুভূত হয়। হৃদয়ের ব্যথা চোখ দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় আরাম হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে অশ্রু একটি রহমত। আঁ হযরত (সঃ) এগুলোকে রহমত বলেই উল্লেখ করেছেন। হতভাগ্য গ্রাম্য আরবরা মনে করত চোখের কঠোরতা পৌরুষের প্রতীক আর কান্না নারীত্বের প্রতীক। আঁ হযরত (সঃ) নিজে যখন কেঁদে ফেলতেন, যদিও তা সেই অর্থে ছিল না, যে অর্থে এখন আমি খুশূ ও খুযূ বর্ণনা করছি। তাঁর কান্না গভীর সত্য ও তত্ত্ব-পূর্ণ হত। তথাপি বুঝানোর জন্য তিনি অশ্রুকে রহমত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং বলেছেন, যে আল্লাহ্র রহমত লাভ করে নি তার চক্ষু শুষ্ক, তার জন্য আমি কি করতে পারি? কান্নার স্বভাবজ শক্তির সম্পর্কে কোন ভয়ানক ঘটনা পড়ে আপনি এটি জানতে পারেন যে, আপনার ভিতর তা আছে কিনা? এর চেয়ে বেশী ফল লাভ সম্ভব নয়। কতক এমন দুর্ভাগা হয়ে থাকে, যেমন আমি বর্ণনা করেছি যে, তাদের চোখ পাথরের মত। যত ভয়ানক ঘটনাই হোক, তা পড়ুক বা শুনানো হোক তাদের চোখে কোন অশ্রু আসে না। কেননা, তারা ঐ সমস্ত বিষয়ে থেকে সম্পর্কহীন হয়ে থাকে। কান্নার সংগে একটি কারণের সম্পর্ক থেকে থাকে। আপনি যখন গল্প পড়েন তখন হোক তা কাল্পনিক চরিত্র কিন্তু মানুষ Make belief-এর মত উপলব্ধি না করে তাতে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করে।

এক সময় আমি একটি শিশুকে দেখি যখন বই পড়া অবস্থায় তার কান্না আসছিল। সে হঠাৎ হাত সরিয়ে বলছিল, না কিছুই না, এটি শুধু একটি ঘটনা মাত্র। সে আমাদের ঘরের শিশুদের মধ্যে কেউ ছিল। আমার খুব হাসি পাচ্ছিল। তথাপি আমি তার বুদ্ধিমত্তায় বিস্মিত হলাম। সে এটা জানত যে, তার কান্না এজন্য আসছে যে, ঐ কথাগুলোতে সে বিশ্বাস করে ফেলেছে। এজন্য সে বারবার এ কথা বলছিল, 'কখনও না, এমন কোন ঘটনা ঘটে নি, এগুলো কাল্পনিক কথা। এভাবে সে নিজেই নিজেকে সংবরণ করছিল। তবে সে এটি জেনে গিয়েছিল যে, তার অন্তর কোমল আর কষ্টদায়ক কথায় কান্না পায়। সে এত জানত যে, সম্পর্কের কারণে কান্না পায়। কিন্তু যদি সম্পর্ক শেষ করে দেয়া হয় তাহলে কোন কান্না পায় না। সুতরাং খুশূ ও খুযূ দু'ভাবে হয়ে থাকে। একটি কৃত্রিম সম্পর্কের কারণে অপরটি প্রকৃত সম্পর্কের কারণে। মা যখন শিশুর জন্য কাঁদে তখন কে বলতে পারে যে, এটি কৃত্রিম? এটি একটি গভীর সম্পর্ক। কিন্তু সেই মা-ই যখন কোন কৃত্রিম গল্প শুনে বা পড়ে কাঁদে তখন তা কৃত্রিম না হলেও অন্তত: বাস্তব নয়। এ হচ্ছে সেই বিষয় যাতে

অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ প্রয়োজন। নইলে কে জানে আল্লাহ্‌র খশিয়ত বা রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর ভালোবাসায় অথবা কোন ঘটনা এমনিতেই পীড়াদায়ক সেজন্য আমাদের কান্না পায়। এটি হচ্ছে ঐ বাক্যগুলোর মুখবন্ধ যা আমি আপনাদের সামনে বর্ণনা করেছি এবং এখন যা আপনাদের সামনে বর্ণনা করব।

খুশু ও খুযূ'র অন্য একটি দিক যা আমি আপনাদেরকে বুঝাতে চাচ্ছি তা হচ্ছে অনেক সময় খুশূ ও খুযূ সাময়িকভাবে এসে থাকে। আবার অনেক সময় স্থায়ী প্রতিক্রিয়া রেখে যায়। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন, "খোদাতাআলা আমাদের ভাগ্যকে শর্তযুক্ত করে রেখেছেন।" ভাগ্যতো শর্তযুক্ত এজন্য এ ধারণা করা যে, এটি অবধারিত অবশ্যই জারী হবে আর একে পরির্তন করা যাবে না, এটি ঠিক নয়।

ভাগ্য আল্লাহ্‌র তক্‌দীরের একটি অংশ। আপনি যদি জানেন যে, কাযা (নিয়তি/ভাগ্য) কত বিষয়ের উপর প্রয়োগ হয় এবং নিয়তির মধ্যে নিয়তি চলে, তাহলে এ অসুবিধাসমূহ সহজে সমাধান হয়ে যাবে। সুতরাং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন, "আল্লাহ্‌তাআলা মানুষের ভাগ্যকে শর্তযুক্ত করে রেখেছেন। যা তওবা, খুশূ এবং খুযূ-এর মাধ্যমে পরিবর্তিত হতে পারে। মানুষ যখন কোন ধরনের অসুবিধা এবং বিপদে পতিত হয় তখন স্বভাবজাত এবং চরিত্রগতভাবে সৎকর্মের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। **'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন'** (নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্‌রই এবং নিশ্চয়ই আমরা তার দিকে প্রত্যাবর্তন করি) এটি ও এর একটি অর্থ। (জীবন চলার পথে) কোথাও কোনও জায়গায় সে এমন আঘাত পায় যে, খোদা থেকে দূরে সরে যাওয়ার সফর খোদার নৈকট্য লাভের সফরে পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেমন পাথরে দেয়ালে নিক্ষেপ করলে তা ফিরে আসে তেমনি অনেক মানুষের দেয়ালে মাথা ঠোকার পর খোদা স্মরণে আসে। তখন সে পাথরের মত ফেরৎ আসে। তবে এ দু'টির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কতক পাথর ফেরৎ আসে কিন্তু কিছু সময় পর মাটিতে পরে যায়। কিন্তু আধ্যাত্মিকতার উপমাস্বরূপ যে রশ্মি রয়েছে (কেননা, আল্লাহ্‌তাআলা আধ্যাত্মিকতাকে রশ্মির সংগে উপমা দিয়েছেন) সেটি যখন কোথাও বাধা প্রাপ্ত হয়ে ফেরৎ আসে তখন তা রাস্তায়ই শেষ হয়ে যায় না। সেটির সফর স্থায়ী হয়ে থাকে। কোথাও কখনও সেটি শেষ হয় না। এভাবে একে মনে করবেন না যে, প্রত্যেক ব্যক্তির সংগে একই ব্যবহার হয়ে থাকে। যেসব ব্যক্তি দুনিয়াদার তাদের পাথর পৃথিবীর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। কিছু সময় খোদার দিকে চলে। তারপর মধ্য পথে পড় যায়। সে সব ব্যক্তি যারা খোদাতাআলার রশ্মি নিজেদের হৃদয়ে রাখে (আমি যেভাবে বলেছি, তাদেরকে নূর বলা হয়) তারা যখনই এমন কোন অবস্থায় পতিত হয় যা মনোবেদনার কারণ হয়, তখন সে দ্রুততার সংগে নিজেদের খোদার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন, "সে স্বভাবজ এবং চারিত্রিকভাবে সৎকর্মের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। নিজের ভিতর এক প্রকার তিক্ততা এবং অস্থিরতা অনুভব করে। যা তাকে জাগ্রত রাখে এবং পুণ্যের দিকে টেনে নিয়ে যায়"। এ হচ্ছে জাগরণ যা স্থায়ী, অস্থায়ী নয়। ওষুধের গুণাগুণকে আমারা যেভাবে পরীক্ষার মাধ্যমে পেয়ে থাকি। তদ্রূপ পরীক্ষায় ব্যস্ত একজন ব্যক্তি যখন খোদাতাআলার আস্তানায় অত্যন্ত বিনীতভাবে বিলীন হয়ে, 'রব্বি' 'রব্বি' (আমার প্রতিপালক, আমার প্রতিপালক!) বলে ডাকে এবং দোয়া করে, সে সত্য-স্বপ্ন অথবা সত্য ইলহামের মাধ্যমে শুভ সংবাদ এবং সান্ত্বনা পায়। পরীক্ষায় ব্যস্ত এসব ব্যক্তি যারা খোদার আস্তানায় ঢোকে তারাই সেসব ব্যক্তি যাদের বর্ণনা আমি প্রথমে করেছি। যারা হৃদয়ে আধ্যাত্মিকতার মর্যাদা বহন করে। সেই আধ্যাত্মিকতার মর্যাদাই তাদের সব সময় ঝুঁকিয়ে রাখে নতুবা তাদের সব সময় ঝুঁকে থাকা সম্ভব নয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) মলফুযাত প্রথম খন্ড ২৭৮ পৃষ্ঠায় বলেন, "খোদার সমীপে আত্মিক ক্রন্দন এবং ব্যাকুলতা প্রত্যেক ধরনের আত্মিক অপবিত্রতা এবং মন্দ বিষয়াবলীকে দূরে রাখে।" তিনি (আঃ) এখানে কেবল ক্রন্দন আর ব্যাকুলতার কথা বলেন নি বরং আত্মিক ক্রন্দন এবং ব্যাকুলতা বলেছেন। অর্থাৎ কেবল বাহ্যিক কান্নায় হৃদয়ের অপবিত্রতা চোখ দিয়ে বের হয় না আর হৃদয় পরিষ্কার ও পবিত্র হয় না। বরং তিনি (আঃ) আত্মার শর্ত দিয়েছেন 'জিগরী' (আত্মা) -এর অর্থ হচ্ছে প্রকৃত পক্ষে সত্য এবং নিজের অভ্যন্তরে অত্যন্ত গভীরতা রাখে। এ অর্থে 'জিগরী'-এর উল্লেখ করেছেন যে, খোদার সমীপে আত্মিক ক্রন্দন এবং ব্যাকুলতা প্রত্যেক ধরনের আত্মিক অপবিত্রতা এবং মন্দ বিষয়াবলীকে দূরে সরিয়ে রাখে। মানুষ এই ব্যাকুলতার মাধ্যমে একবার যখন (এই মন্দকে) পরিষ্কার করে দেয় তখন পুনরায় সেই (মন্দ) বিষয়াবলীকে ফিরিয়ে আনে না। এটি হচ্ছে চিহ্ন যা প্রত্যেকের জন্য খোলা রয়েছে। কেউ একথা বলতে পারবে না যে, এটি খুব কঠিন বিষয় যা আমরা বুঝি না। একে চেনা আমাদের সাধ্যের বাইরে। সাময়িক তওবার পরে স্থায়ীভাবে কর্মের যে ক্ষেত্র বাকি থাকে তা চেনার মাধ্যমে একে চেনা যেতে পারে। যদি ক্রন্দন আর ব্যাকুলতা সাময়িক হয় তবে মানুষ সাময়িকভাবে নিজেকে হালকা অনুভব করে। এমন ক্ষেত্রে অধিকাংশ কান্নায় মানুষের ঘুম এসে যায়, এজন্য যে, হৃদয় হাল্কা হয়ে যায়। প্রত্যেক কষ্ট দূর হয়ে যায় কিন্তু তা যদি আত্মিক না হয় তাহলে যে মন্দ বিষয়াবলী দূর হয়ে গেছে তা দিয়ে পুনরায় হৃদয় ভরে যাবে। কোন মন্দই পরিষ্কার হয় নি বরং কান্নায় কষ্ট কেবল দূর হয়ে থাকে। এ অর্থেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "আল্লাহ্‌ওয়ালাদের তওবার সময় নির্গত নিষ্ঠাভরা অশ্রু বিন্দু বিলাসিতাকামী, ধোঁকাবাজ এবং অন্ধকারে নিমজ্জিতদের নদী পরিমাণ অশ্রুর চেয়েও উন্নত এবং শ্রেয়ঃ" ঐ এক বিন্দু অশ্রু কী? যা মানুষের জীবনে যেন রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করে। অথচ মাত্র এক বিন্দু অশ্রু। ঐ বিন্দু যখন খোদাকে সন্তুষ্ট করে তখন ঐশী কল্যাণ এবং রহমতর বৃষ্টি হয়ে যায়। কেননা, আল্লাহ্ নিষ্ঠার প্রাণকে কখনো নষ্ট হতে দেন না। নিষ্ঠার রূহের সাথে যদি এক বিন্দু অশ্রুও প্রবাহিত হয় তাহলে সেটিই অবিরাম বর্ষণরত রহমতের বৃষ্টিতে রূপ নেয়। তিনি (আঃ) যে 'তওবাতুন্‌নসূহ' (পরিপক্ক তওবা)-এর কথা বলেছেন এর অর্থ এমন তওবা যাতে যে কর্মগুলো থেকে তওবা করা হয়েছে সেগুলোর কোন খেয়ালই হৃদয়ে আসে না। এ তওবা তখনই সম্ভব যখন মানুষ ঐ কর্মগুলোর অমঙ্গল, মন্দ, ও ঘৃণ্য স্বরূপকে সম্পূর্ণভাবে জানতে পারবে। (তওবাতুন্‌নসূহ)' এর বিষয়টিকে লাভ করা অত্যন্ত দুষ্কর। এটি ঠিক যে, আল্লাহ্‌র মু'মিন বান্দা নিজেদের কতক মন্দকর্ম সম্পর্কে অজানাভাবে জ্ঞাত হয়ে যায়। আংশিকভাবে যেগুলো জ্ঞাত হয় সেগুলোকে ছেড়েও দেয়। আমি যেভাবে বারংবার বলেছি যে, এটি একটি চলমান সফর। প্রত্যেক আল্লাহ্‌ওয়ালাদের নিজ নিজ পদমর্যাদা এবং স্থান রয়েছে যা অনুযায়ী এ সফর সব সময় বাকি থেকে যায়। তবে তওবাতুন্‌নসূহ অন্য একটি বিষয়েরও নাম। তওবাতুন্‌নসূহ এর অর্থ মানুষের সমস্ত মন্দকর্ম, অনিষ্ট ভয়ানকভাবে উলঙ্গ হয়ে যাবার পর সেগুলোর কোন একটির সংগেও সম্পর্ক না রাখা। মন্দের সংগে সম্পর্ক না রাখা কঠিন পরীক্ষার দাবী করে।

কঠিন বটে আবার সহজও। সহজ এ অর্থে যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, যদি আল্লাহ্‌র সংগে সত্যিকারের সম্পর্ক হয়ে যায় তাহলে 'তওবাতুন্‌নসূহ' -এর একটি অবস্থা সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্‌র রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী প্রত্যেক বিষয় অত্যন্ত ঘৃণিত এবং জঘণ্য মনে হয়। যে বিষয়ই তাঁর (আল্লাহ্‌র) সংগে সম্পর্ক ছিন্ন করার কারণ হয় মানুষ সেই বিষয়ের সংগেই সম্পর্ক ছিন্ন করে। দ্বিতীয়টি দোয়া এবং পরিশ্রমের মাধ্যমে সম্ভব হয়। **ওয়াস্‌তাইনু বিস্‌সব্‌রি ওয়াস্‌সালাত**– এর যে বিষয় চলছে তা তওবাতুন্‌নসূহ পর্যন্ত পৌঁছানের একটি দীর্ঘ সফরের ক্ষেত্র।

এখন আমি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর তুলনামূলক বড় উদ্ধৃতি পড়ছি। আমি জানি না অবশিষ্ট সময়ে মধ্যে শেষ করতে পারব কিনা। তবে যতটুকু পারা যায় পড়ার পর খুতবা শেষ হবে। তিনি (আঃ) বলেন, "স্মরণ রাখা উচিত যে, বিনয়, নম্রতা এবং শিষ্টতার জন্য খোদার সংগে সত্যিকার সম্পর্ক কায়েম হওয়া আবশ্যক নয়।" এখানে তিনি (আঃ) সতর্ক করছেন, বরং অনেক সময় আল্লাহ্‌র ক্রোধের নমুনা দেখে দুষ্ট লোকদেরও বিনয় এসে থাকে। সেই পাথরের কথা, যা রাস্তায় পতিত হয়। সেখান থেকে বিষয়টি শুরু হয় এরপর হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এ বিষয়ের সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম দিক বিশ্লেষণ করেছেন।" অনেক সময় আল্লাহ্‌র ক্রোধের নমুনা দেখে দুষ্ট লোকদেরও বিনয় এসে থাকে। অথচ নোংরা কাজ থেকে বিরত হয় না। উদাহরণস্বরূপ, ১৯০৫ সনের ৫ এপ্রিলের ভূমিকম্পের কথা উল্লেখ করা যায়। এটি কাঙ্গরার ভূমিকম্প হিসেবে পরিচিত। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এসেছিল যা একটি ব্যাপক এলাকা ধ্বংস করেছিল। তিনি (আঃ) বলেন, "সেই ভূমিকম্প আসার সময় লক্ষ লক্ষ হৃদয়ে এমন বিগলন এবং বিনয় সৃষ্টি করেছিল যে, আল্লাহ্‌র নাম নেয়া আর কান্না ছাড়া অন্য কোন কাজ তাদের ছিল না। ঐ কল্পনা অনেক দিন পর্যন্ত পুনঃপুনঃ এসেছিল। এজন্য যতক্ষণ ভূমিকম্প জারী ছিল ঐ পুরো সময় ব্যাপী তাদের হৃদয়েও কম্পন জারী ছিল। খোদার ভয়ে বারংবার কান্না আসছিল এবং বাহ্যতঃ তাঁর (আল্লাহ্‌র) দিকে আকৃষ্ট হচ্ছিল। এমনকি নাস্তিকরাও তাদের নাস্তিকতা ভুলে গিয়েছিল।" এ ধরনের অনেক ঘটনা আমাদের ইতিহাসে রক্ষিত আছে। কোয়েটার ভূমিকম্পের সময়ে কি হয়েছিল? কীভাবে কতক নাস্তিক সেই সময় খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসী হয়েছিল। কিন্তু যখন (ভূমিকম্পের) সেই সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে তখন পুনরায় সেই নশ্বর জীবনের দিকে ফিরে গিয়েছে। অতপর যখন সময় অতিবাহিত হতে থাকে আর যমীন স্থির হয়ে যায় তখন বিনয়ের অবস্থা অদৃশ্য হয়ে যায়।" যখন যমীন স্থির হয়ে গিয়েছিল সেই সময় যে বিনয়ের অবস্থায় এক চাঞ্চল্য অনুভূত হচ্ছিল তা-ও শেষ হয়ে যায়। কেননা, সেটি পৃথিবীর সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। আল্লাহ্‌র সংগে নয়। সুতরাং যখন পৃথিবী স্থির হয়ে গেল তখন তাদের হৃদয়ের চাঞ্চল্যও স্থির হয়ে গেল। তিনি (আঃ) বলেন, "শুনেছি যে অনেক নাস্তিক যারা সে সময় খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসী হয়ে গিয়েছিল তারা অত্যন্ত নির্লজ্জতার সংগে বলেছে, 'আমাদের ভুল হয়ে গেছে আমরা ভূমিকম্পের দাপটে প্রভাবিত হয়েছি।' বস্তুতঃ আমরা বারংবার লিখেছি যে, "বিনয়ের সংগে অনেক অপবিত্রতাও থাকতে পারে।" এজন্য প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের বিনয়কে যাচাই করা উচিত। যতক্ষণ পর্যন্ত অপবিত্রতা থাকবে ততক্ষণ তা কৃত্রিম বিনয়, বাস্তবতার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই তথাপি তা ভবিষ্যতের সমস্ত চরম উৎকর্ষতার জন্য বীজস্বরূপ। তিনি (আঃ) বলেন, "এটি অবশ্যই বীজ বিশেষ।" সেই সময় যখন মানুষের হৃদয় প্রকম্পিত হয় এবং সাময়িকভাবে তার মধ্যে বিনয়ের সৃষ্টি হয়, তা ভবিষ্যতে মানবাত্মার পরিবর্তনের জন্য বীজের কাজ করতে পারে। এর ফলে যে সফর শুরু হয় তা একটি স্থায়ী সফর হতে পারে। তবে এ অবস্থাকে পূর্ণতা মনে করে নিজের আত্মাকে ধোঁকা দেওয়া হবে। বরং এরপর আরও একটি মর্যাদা রয়েছে যার সন্ধান মু'মিনের করা উচিত। কখনও আরাম নেয়া ও অলসতা করা উচিত নয়। **'ইসতাইনু বিস্‌সব্‌রি ওয়াস্‌সলাত'** এ আয়াতের সাথে সমস্ত বিষয়টি সম্পর্কযুক্ত। আর এটি সেই মর্যাদা যাকে আল্লাহ্‌র কালামে *'ওয়াল্লাযিনা হুম আনিল লাগবি মু'রিজুন।'* এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

এখানে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আরেকটি পরিচয় ও আরেকটি পর্যালোচনার পদ্ধতি আমাদের শিখিয়েছেন। যা তাঁর (আঃ) ভাষায় **ওয়াল্লাযিনা হুম আনিল লাগবি মু'রিজুন'** অর্থাৎ মু'মিন কেবল ঐ ব্যক্তিই নয়, যে নামাযে বিনয় অবলম্বন করে বরং মনের উত্তাপ সত্বেও সমস্ত নিরর্থক বিষয়, কাজ এবং সম্পর্ক থেকে দূরে থাকে। এখানে 'বাওজুদ' (সত্ত্বেও) এই অর্থে নয় যে, বিনয় যদি না হয় তাহলে এমন হবে। তিনি (আঃ) বলেন, বিনয়ের কারণে, বিনয়ের সত্তার অস্বিত্বের কারণে 'বাওজুদ' শব্দের অর্থ এখানে এই। বিনয়ের কারণ মনের উত্তাপ, সমস্ত নিরর্থক বিষয় এবং সম্পর্ক থেকে দূরে সরে থাকে। নিজের বিনয়কে নিরর্থক কাজ এবং অহেতুক কথার সাথে মিলিয়ে খারাপ হতে দেয় না। স্বভাবত: সমস্ত নিরর্থক কথা থেকে পৃথক হয়ে যায়। **'হুম আনিল লাগবি মু'রিজুন'**, নিরর্থক কথা এবং কর্ম থেকে তাদের হৃদয়ে অপসন্দের সৃষ্টি হয়। এটি এ কথার দলিল হয়ে থাকে যে, খোদাতাআলার সংগে কিছু সম্পর্ক হয়ে গিয়েছে। কেননা, মানুষ একদিক থেকে তখনই মুখ ফিরিয়ে নেয় যখন অন্যদিকে তার সম্পর্ক হয়ে যায়। সুতরাং নিরর্থক বিষয়াদি থেকে পরিত্রাণের পদ্ধতিও হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আল্লাহ্‌র সংগে সম্পর্কের ভিত্তিই উল্লেখ করেছেন। নিরর্থক বিষয় থেকে হঠাৎ করেই মুক্ত হওয়া যায় না। *ওয়াসতাঈনু বিস্‌সব্‌র ওয়াস্‌সলাত'* এর যে সম্পর্ক রয়েছে তা হঠাৎ করে ছিন্ন হয় না এতে অবশ্যই আল্লাহ্‌ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করে সর্ব প্রথম এবং সর্বশেষ যে জিনিসটি চাওয়া উচিত তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র সত্যিকার ভালোবাসা। কেননা, নিরর্থক বিষয়টি থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করতে কোন কষ্ট হয় না। ভালোবাসার জন্য যদি সম্পর্ক ছিন্ন করেন তাহলে তা অত্যন্ত সহজ। একদিকে আকর্ষণ বেশী আরেক দিকে আকর্ষণ কম সুতরাং যেদিকে বেশী আকর্ষণ হবে সাধারণভাবে বিষয়টি সেদিকেই গড়াবে, কষ্ট অনুভূতই হয় না। মাধ্যাকর্ষণ শক্তিতেও তাই। চুম্বক যখন ভারি জিনিসকে মাটি থেকে উঠিয়ে আনে তখন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তো শেষ হয়ে যায় না বরং অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী আকর্ষণ তাকে নিজের দিকে টেনে নেয়। এ বিষয়টিই হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বর্ণনা করেছেন। পার্থিব সম্পর্কসমূহ সর্বদা তোমাদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে থাকবে যদি তোমরা সেগুলো থেকে এভাবে মুক্তি পেতে চাও যে, সেগুলো স্বভাবজ হয়ে যাক আর তোমাদের কষ্ট না করতে হয়। অর্থাৎ একবার যদি আল্লাহ্‌র সাথে তোমার সম্পর্ক কায়েম হয়ে যায় তাহলে সেই সম্পর্ক তোমাকে টেনে নেবে আর পার্থিব আকর্ষণ দুর্বল হয়ে যাবে। যদি এমন না হয় (খোদার) সম্পর্ক আকর্ষণ না করে তাহলে পরিশেষে পার্থিব আকর্ষণ অবশ্যই তোমাকে নিজের দিকে টেনে নেবে।

"যখন হৃদয়ের সংগে রহীম খোদার সম্পর্ক হয়ে যায় এবং হৃদয়ে তাঁর প্রতাপ এবং সম্মান প্রতিষ্ঠিত হয়।" এটি উদ্ধৃতির শেষ অংশ ছিল। অবশিষ্ট উদ্ধৃতিগুলো আমি ইনশাল্লাহ্‌ আমার পরবর্তী খুতবাসমূহে বর্ণনা করব। *(ওডিও ক্যাসেট থেকে শ্রুত ও অনূদিত)*

অনুবাদ– মাওলানা বশীরুর রহমান
সদর মুরব্বী

উটেচড়া নবী চাঁদেচড়া মানুষ

(২৫তম কিস্তি)

তায়েফে তবলীগী প্রয়াস ঃ

মক্কার লোকেরা যখন কিছুতেই আঁ হযরত (সঃ)-এর আহ্বানে ইসলাম গ্রহণ করছিল না বরং নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে যাচ্ছিল তখন তিনি তায়েফে গিয়ে সত্য প্রচারের সংকল্প করলেন। তায়েফ মক্কার দক্ষিণ-পূর্বে প্রায় ৮০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত একটি শহর। ঐ এলাকায় প্রচুর ফল-ফলাদি ও শস্যাদি উৎপন্ন হতো। ঐ শহরে ধনবান, সম্পদ ও প্রভাবশালী লোকেরা বাস করতো। তারা রূঢ় ও অহংকারী ছিলো। তাদের সাথে মক্কাবাসীদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিলো। সেখানে মক্কাবাসীদেরও ক্ষেত-খামার ও বিষয়-সম্পত্তি ছিলো। মূর্তিপূজায় তায়েফবাসীরা কারো পেছনে ছিলো এমনটি বলা যাবে না।

হযরত (সঃ) শুধু হযরত যায়েদ (রাঃ)-কে সাথে নিয়ে তায়েফ গিয়ে ছিলেন। যখন তিনি তায়েফবাসীদের মাঝে প্রচার কার্য শুরু করলেন তখন তারা আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ)-এর কথার গুরুত্ব বুঝতে কোনই চেষ্টা না করে বরং উল্টো হাসি-বিদ্রূপ ও ইটপাথর ছুঁড়েই ক্ষান্ত হলো না উপরন্তু গুন্ডা-বদমাইশদের ক্ষেপিয়ে দিলো, আর লেলিয়ে দিলো কুকুরের দলকে অনাহারে, রক্তক্ষয়ে ক্লান্ত হয়ে কোথাও বসলে তাঁকে টেনে তুলতে বাধ্য করতো। ঐ অবস্থায় আবার তারা পায়ে পাথর মারতো, হুযূর (সঃ)কে রক্ষা করতে গিয়ে- হযরত যায়েদ (রাঃ)-ও রক্তাক্ত হতেন। এরা হুযূর (সঃ) ও যায়েদ (রাঃ)-কে যতক্ষণ পর্যন্ত না শহর হতে কয়েক কি.মি. দূরে একটা পাহাড়ে নিয়ে পৌছাল ততক্ষণ ওরা তাঁদের পিছু ছাড়লো না। 'রহমাতুল্লীল আলামীন' এ অবস্থাতেও নিজের ব্যথা-বেদনার কথা না ভেবে, ভাবছেন খোদার গযব যদি ওদের উপর নাযিল হয়। তিনি আকাশের দিকে মুখ তুলে দেখছিলেন আর এদের জন্যই কাতর হৃদয়ে দোয়া করছিলেন, 'ইলাহী! তুমি এদেরকে ক্ষমা করে দাও। কেননা, এরা জানে না, এরা কী করছে।' মানব কল্যাণের চূড়ান্ত সীমায় পৌছুলেই কারো পক্ষে এরূপ পরিস্থিতিতে ও অত্যাচারীর জন্যে দোয়া করা সম্ভপর হয়।

জখমে জখমে এবং লোকদের তাড়ানায় [আঁ হযরত (সঃ)-এর] দেহে চলার মত শক্তি ছিল না। এমতাবস্থায় তাঁরা একটি আঙ্গুরের বাগানের ছায়ায় আশ্রয় নিলেন। বাগানটি ছিলো মক্কার দু' নেতার। তারা তখন বাগানেই ছিলো। ইসলামের ঘোর শত্রু হওয়া সত্ত্বেও কী ভেবে তাদের গোলাম আদ্দাসকে দিয়ে মুসাফিরদের জন্য এক থালা আঙ্গুর পাঠিয়ে দিলো। আদ্দাস ছিল খৃষ্টান। হুযূর (সঃ) **বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম** বলে সেই আঙ্গুর গ্রহণ করলেন, তখন তার মাঝে খৃষ্ট ধর্মের স্মৃতি উদয় হলো। তার মনে হলো সামনে যেন খোদার এক নবী বসে আছেন, যিনি ইসরাঈলী নবীদের মতই কথা বলছেন। তাকে রসূলে করীম (সঃ) জিজ্ঞেস করেন, তোমার দেশ কোথায়? উত্তরে বল্লো 'নিনেভা'। তখন তিনি বল্লেন, সেই সাধু ব্যক্তি ইউনুস (আঃ) যিনি মত্তার পুত্র এবং নিনেভার বাসিন্দা ছিলেন, তিনিও আমার মতই আল্লাহ্‌তাআলার এক নবী ছিলেন। তিনি তখন আদ্দাসকে তবলীগ শুরু করে দিলেন যেজন্য তিনি তায়েফে এসেছেন। অল্পক্ষণের কথা-বার্তাতেই অপরিচিত ক্রীতদাস অশ্রুভরা চোখে হুযূর (সঃ)-এর পদতলে লুটিয়ে পড়লো ও তাঁর হাত পায়ে চুমো খেতে লাগলো। কি মধুময় স্বর্গীয় দৃশ্য! আদ্দাসের সাথে কথা বলা শেষ করে তিনি আল্লাহ্‌র কাছে এই দোয়া করলেনঃ

'হে আমার আল্লাহ্। আমি তোমারই কাছে আমার সব দুর্বলতা এবং আমার মানসম্মানের কমতি এবং লোকের দৃষ্টিতে আমার হেয় প্রতীয়মান হওয়ার অভিযোগ করছি। কিন্তু তুমি তো দরিদ্র ও দুর্বলদের খোদা। তুমি আমারও খোদা। তুমি আমাকে কার হাতে ছেড়ে দিবে? অপরিচিত যারা তাদের হাতে? যারা আমাকে এদিকে সেদিকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে? কিংবা সেই শত্রুদের হাতে যারা আমার জন্মভূমিতেও আমার উপরে নির্যাতন চালাবে? যদি আমার প্রতি তোমার কোন ক্রোধ না থাকে, তাহলে আমি ঐ সব শত্রুর কোনও পরওয়া করি না। তোমার দয়া আমার সাথে আছে। তোমার নিরাপত্তা আমার জন্য যথেষ্ট প্রশস্ত। আমি তোমার চেহারার আলোর মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করছি। এটা তোমারই কাজ যে, তুমি দুনিয়া থেকে অন্ধকার দূর করে দাও, এবং সবাইকে এই দুনিয়াতে এবং পরবর্তী দুনিয়াতে শান্তি দান কর। তোমার ক্রোধ এবং তোমার শাস্তি যেন আমার উপরে না পড়ে। তুমি তো অসন্তুষ্ট হও এই জন্য যে, যেন পরক্ষণেই আবার সন্তুষ্ট হতে পার। এবং তোমাকে ছাড়া তো কোন সত্যিকার শক্তি ও সত্যিকার আশ্রয় নেই।' (ইবনে হিশামঃ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৪৭; তর্জমা নবীনেতা হতে উদ্ধৃত। এ দোয়ার মাঝে আল্লাহ্‌র সাথে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর নিবিড় সম্পর্কের প্রতিফলনই চাক্ষুষ হয়ে উঠেছে।

যায়েদের সাহায্যে কোন প্রকারে তায়েফ ছেড়ে মক্কার পথে যাত্রা করেন। পথে নাখলা নামক স্থানে কয়েক দিন বিশ্রাম নেন। হিরা নামক স্থানে এসে মক্কায় আশ্রয় লাভের প্রচেষ্টা চালান। অবশেষে মুত'ইম ইবনে আদী আশ্রয় দানে রাজি হন। বাস্তবে এ আশ্রয়ের তেমন কোন গুরুত্ব ছিল না। কুরায়েশ নেতারা তাদের প্ল্যানমত চরম বিরোধিতা চালিয়েই গেলো।

হুযূর (সঃ)-এর তায়েফ সফর দ্বারা ইসলামের কট্টর সমালোচকরাও যে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছেন এর একটি উদাহরণ তুলে ধরা হলো। স্যার উইলিয়াম মুইর তার বিখ্যাত পুস্তক 'লাইফ অব মাহোমেট'-এ বলেছেন (বাংলা তর্জমাঃ) 'মুহম্মদের তায়েফ ভ্রমণের মধ্যে এক উন্নত মহিমা ও সাহসিকতা বিদ্যমান। একজন একা মানুষ, যিনি নিজের জাতির লোকজনের দ্বারা অত্যাচারিত ও প্রত্যাখ্যাত, তিনি আল্লাহ্‌র নামে নির্ভয়ে নিনেভার ইউনুসের মত একটি পৌত্তলিক শহরকে আহ্বান জানাচ্ছেন অনুতপ্ত হওয়ার জন্যে এবং তার মিশনকে সমর্থন করার জন্য। এই ঘটনা তাঁর আহ্বানের ঐশী উৎসের প্রতি তাঁর যে গভীর বিশ্বাস তা উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত করে তুলছে।'

মদীনার উর্বর ভূমিতে সত্যের বীজ ছড়িয়ে পড়ছে ঃ

প্রকাশ্যে প্রচারের নির্দেশ পাওয়ার পর হতে মক্কার বাইরেও যাতে ইসলামের প্রচার সম্প্রসারিত হয় সে জন্য আঁ হযরত (সঃ)-এর চেষ্টার কমতি ছিল না। এ প্রচেষ্টা তায়েফ সফরের পূর্ব হতেই চলছিল। বিশেষ করে হজ্জের সময় ও ওকাযের মেলায়। বহু গোত্রের লোকজন ওসবে উপস্থিত হতো। তিনি তাদের নিকট ইসলামের বাণী পৌছাতেন। কেউ তাঁর কথা শুনতো, কেউ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে চলে

(অবশিষ্টাংশ ৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

জুমুআর খুতবা

ওয়াকফে নও শিশুদের তরবীয়ত

স্মরণ রাখুন! শিশুদের তরবীয়তের জন্যে প্রথমে আপনাদের নিজেদের তরবীয়ত অবশ্যই করতে হবে

[সাইয়্যেদনা হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) প্রদত্ত ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯, মসজিদে ফযল, লন্ডন।]

তাশাহ্হুদ তাআওউয ও সূরা ফাতিহা তিলাওয়াতের পর হুযূর (আইঃ) বলেন, বিগত কয়েক বছর ধরে যেখানে আমি আহমদী জামাতকে দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র প্রতি ধারাবাহিকতার সাথে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছি সেখানে সাথে সাথে এ কথার ওপরেও জোর দিয়ে আসছি যে, আপনাদের চরিত্রকে মাহাত্ম্যপূর্ণ করার চেষ্টা করুন।কেননা, কুরআন করীম থেকে বহুবার বিভিন্ন স্থানে এই সুস্পষ্ট পথ-নির্দেশনা পাওয়া যায় যে, **যতক্ষণ পর্যন্ত চরিত্রে মাহাত্ম্য সৃষ্টি না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কথায়ও মাহাত্ম্য সৃষ্টি হতে পারে না। আর দোয়ায়ও মাহাত্ম্য সৃষ্টি হতে পারে না।** কুরআন করীমের এক স্থানে আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, তোমাদের দোয়া আকাশে সম্মানিত হতে পারে না, আকাশে উত্থিত হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের চরিত্র উহাকে উন্নীত না করে। এতে দোয়ার কবুলিয়তের ব্যাপারে অতি গভীর রহস্য নিহিত আছে। আবার অন্য এক স্থানে কোন এক উপলক্ষ্যে বলেছেন, সুন্দর কথা খুবই ভাল এতদ্ব্যতিরেকে দাওয়াত ইলাল্লাহ্ সম্ভবপর নয়। কিন্তু শর্ত এই যে, সাথে সাথে আমল ও কর্ম যেন ভাল হয়। তাই প্রকৃতপক্ষে এ উভয় বিষয়-বস্তু একই কেন্দ্রীয় দর্শনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। দোয়ার প্রসঙ্গেও ঐ একই কথা অর্থাৎ মাহাত্ম্যপূর্ণ চরিত্র সাথে থাকলে খোদাতাআলা তখন তখনই কথা শুনে থাকেন। আর এ ছাড়া দোয়ায় শক্তি সৃষ্টি হয় না, তাই বান্দা কীভাবে তোমাদের কথা শুনবেন। যে খোদার তুলনায় কম দয়াময় ও করুণাময়, কম দৃষ্টিদানকারী, খোদার তুলনায় খুবই কম- অর্থাৎ আসলে কোন তুলনাই হয় না তোমাদের ভুল-ত্রুটিকে উপেক্ষাকারী- আল্লাহ্ তো কতক দুশ্চরিত্রবানেরও দোয়া শুনে থাকেন। কখনও অসৎ কর্ম করে এমন লোকের দোয়াও শুনে থাকেন- কিন্তু বান্দাদের মধ্যে ইহা খুবই কম পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে। স্বয়ং তাদের কর্ম যা-ই হোক না কেন, যদি ভাল কাজের প্রতি আহ্বানকারীর মধ্যে স্বল্প পরিমাণ দুর্বলতাও পায় তাহলে তাদের অধিকাংশই ঐ দুর্বলতাকে সমক্ষে উপস্থাপন করে দেয়। তার সারাটা ভাল কাজ এ কারণে বাতিল করে দেয় এই বলে যে, এ বক্তার মধ্যে এই মন্দ পাওয়া গিয়েছে। তাই কুরআন করীম থেকে যখন ইহা জানা গেলো যে, মৌলিকভাবে দোয়ার সাথে মাহাত্ম্যপূর্ণ চরিত্র সম্পৃক্ত আর খোদার করুণা অসীম হওয়ার কারণে আল্লাহ্‌তাআলা তো যখন চান, যার জন্যে চান দোয়া শুনতে পারেন-- একথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু বান্দা সাধারণত: কঠিন অন্তঃকরণের অধিকারী হয়ে থাকে, অধিক পরিমাণে খুঁত খুঁতে হয়ে থাকে অথচ তার ওপরে ঐ ভাল কথাই প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে যার সাথে মাহাত্ম্যপূর্ণ চরিত্র মজুদ থাকে। তাই মুবাল্লিগ হওয়ার জন্যে জামাতকে নিজেদের চরিত্রের গুণগত মান উন্নত করা খুবই আবশ্যক। আর যেখানে দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় সেখানেই আমার মধ্যে এ চিন্তা আরম্ভ হয় যে, দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌কারী নিজের কোন পবিত্র পরিবর্তন সাধনও করেছে কি না করে নি। যেখানে করে থাকে সেখানে ফল ধরতে আরম্ভ করে। যেখানে এ প্রসঙ্গে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হয় না- ব্যবস্থাপনার দিক থেকেও নয় আর ব্যক্তিগত ভাবেও নয় সেখানে তালিকাসমূহ তো প্রণীত হয়ে থাকে কিন্তু তাতে ফল ধরে না। এ বিষয়ের গুরুত্ব আমি আমার বিগত ওয়েল্‌স (Wales) ভ্রমণে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করেছি। ওয়েল্‌সে কয়েকদিনের জন্যে গিয়েছিলাম। সেখানে এলাকার সম্মানিত লোকদের একটি প্রশ্নোত্তর সভার আয়োজন করেছিলো জামাত। আমার সাথে বাম পার্শ্বে সেখানকার শহরের খুবই জনপ্রিয় বন্ধু ও মেয়র বসেছিলেন। তিনি আমাকে বল্লেন, আপনি ইতঃপূর্বে এখানে যে সভার আয়োজন করিয়েছিলেন যাতে কুরআন করীমের ওয়েল্‌স ভাষায় অনুবাদের যে আবরণ উন্মোচন করা হয়েছিলো, এতে লম্বা ধরনের একজন ইংরেজ ছিলেন এবং ইয়ার্কশায়ার থেকে এসেছিলেন, তিনি কে? আমি তাকে বল্লাম, তিনি ছিলেন নোমান নিউম্যান ও ওয়েল্‌সের সাথেই সম্পর্ক রাখেন এবং ওয়েল্‌স আহমদী। আর সম্ভবতঃ এদিক থেকে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব হওয়ার অধিকারী যে, তিনি প্রথম ওয়েল্‌স আহমদী। এর পরে এক দীর্ঘ সময় ধরে তিনি বারে বারে ইহাই বলতে থাকেন যে, **এ ব্যক্তির চেহারায় এমন সততার ছাপ ছিলো এবং এ সততার এমন গভীর প্রভাব আমার হৃদয়ে সৃষ্টি হয়েছিলো যে, তার সাথে কথা বলতে বলতে আমার এই দৃঢ়-বিশ্বাস জন্মেছিলো যে, এ ব্যক্তি সত্যবাদী আর যে কথা বলছিলো তাতে ধোঁকা হতে পারে না।** তিনি বল্লেন, এ ব্যক্তি আমার প্রাণে এমন গভীর প্রভাব বিস্তার করলো যদিও সামান্য কথা-বার্তাই হয়েছিলো ; কিন্তু যখন তার চাল-চলন দেখলাম, তার কথা বলার ধরন দেখলাম, তার চোখের ভিতর আলো দেখলাম তখন আমার নিকট আপাদমস্তক, সত্য দেখা দিলো। তিনি বল্লেন, এখন থেকে নিয়ে আমি প্রত্যেক বৈঠকে ইহা বলে থাকি যে, তোমরা যে কতক মুসলিম দেশের কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতে ইসলামকে দোষারোপ(Condemn) করে থাকো ইহা ঠিক নয়। এস্থলে আমি তাদেরকে বলি, আমি এমন মুসলমান দেখেছি যাদের নিকট থেকে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারো, যা কিনা কৃতিত্ব ও চরিত্রের দিক থেকে একটি মার্গ ও একটি দৃষ্টান্ত। এজন্যে গাম্ভীর্যের সাথে ইসলামের ব্যাপারে উহার সত্যতা যাচাই করার প্রতি দৃষ্টি দাও আর এতে তোমরা অনেক সত্য কথা অবহিত হতে পারবে। আবার তিনি আমাকে বল্লেন, যে সব পুস্তক আমাকে দেয়া হয়েছিলো আমি ওগুলো পড়ছি এবং ভবিষ্যতের জন্যে আমি ইহা সিদ্ধান্ত করে নিয়েছি যে, আমার রাজনৈতিক কৃতিত্ব ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকলেও আমি এতে উৎসাহ নিবো। আর লোকেরা ইহা বলতে আরম্ভ করেছে যে, এতো মুসলমানদের প্রতি ঝুঁকে গেছে। এতদ্‌সত্ত্বেও যে, এখানকার কতক লোক এমন মুর্খ যে, যখন আমি তাদেরকে বুঝাই তখন তারা ইহা বলে দেয় যে, তোমার ওপরে শয়তানের প্রভাব পড়েছে। কিন্তু আমি তাদেরকে বলি যে, তোমাদের মূর্খতাই আসলে শয়তানী প্রভাব। কেননা, সত্যতার অন্বেষণ না করা আর সত্যতার দিকে চোখ বন্ধ করে রাখা এবং এ সম্ভাবনাময় পথকে সবসময়ের জন্যে বন্ধ করে দেয়া এই বলে যে, তোমাদের নিকট ছাড়া অন্য স্থানে সত্যকে লাভ করা যেতে পারে না মূর্খতা। তিনি বল্লেন, আমার নিকট ইহা শয়তানী কার্যকলাপ। আর আসলেই এ কথা ঠিক। তাই নিষ্ঠাবান আহমদী এই যে সুপ্রভাব ছড়ালেন এ ব্যাপারটি ঐ ব্যক্তি পর্যন্ত শেষ হয় নি বরং তিনি মশাল বাহীতে পরিণত হলো আর প্রভাবান্বিত হওয়ার কারণে খোদার আশীষক্রমে বড় বড় ভাল সমাবেশে একথা পৌঁছাতে ছিলেন এবং আল্লাহ্‌তাআলার আশীষক্রমে ঐ বন্ধু যিনি এ মজলিসে এসেছিলেন তার মধ্যে একটি সুস্পষ্ট পরিবর্তন আমি দেখেছি, উৎসাহ দেখেছি এবং অধিক সংখ্যক লোক এ কথা ব্যক্ত করেছে যে, আমরা উৎসাহকে দীর্ঘস্থায়ী করতে চাই এবং সাময়িক সাক্ষাৎকারে হবে না বরং আমরা ইনশাল্লাহ্ (ইনশাল্লাহ্ তো তারা বলেন নি আমি নিজ

থেকে বলছি) আমরা অবশ্যই জামাতী পুস্তক-পুস্তিকা পড়বো। সুতরাং এক বন্ধু, যখন আমরা দ্বিতীয় দিন রওয়ানা দিয়েছি, স্বল্প সময়ের জন্যে পথে আমাদের বাধা দিলেন। সেখানে তিনি একজন আহমদীকে বলেছিলেন যে, যখন তিনি আসেন অবশ্যই যেন আমার সাথে সাক্ষাৎ করানো হয়, আমি তাঁর সাথে ছবিও উঠাবো এবং কথাও বলবো। সুতরাং তিনি এমনি ধরনের পুণ্য বাসনার কথা বল্লেন, যদ্বারা জামাতে উৎসাহ সৃষ্টি কর হলো, ইসলামের জন্যে একটি মহান দরজা খুলছে আর ইহাই ঐ পথ যদ্বারা আসলে লোকদের ইসলামে প্রবেশ করতেই হবে। আশে পাশে দেয়াল দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে। বহু মুসলিম দেশ তাদের মূর্খতাপূর্ণ আইনের কারণে ইসলামের বদনাম করেছে এবং যেসব রাস্তা দিয়ে লোকেরা ইসলামের প্রবেশ করতে পারতো স্থানে স্থানে এসব রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। তাই দরজা যদি থাকে তো আহমদী জামাতের দরজাই অবশিষ্ট আছে। কিন্তু এ দরজাকে ব্যাপকতর করা একটি মৌলিক বিষয়। আর এই দরজা এ রকম তো নয় যেভাবে আমাদের মসজিদের সামনের দরজা রয়েছে অথবা আপনাদের ঘরে দরজা রয়েছে। ইহা একটি প্রতীকী দরজা যা কিনা ব্যাপকতর হতে পারে। আর এ ব্যাপকতা আহমদীদের মহান ব্যক্তি চরিত্রের মাধ্যমে সৃষ্টি করা উচিত, নচেৎ এ দরজা সংকীর্ণ থাকবে খুলবে না। এক নু'মানের **প্রয়োজন নয় লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নুমানের প্রয়োজন। তারা বিভিন্ন দেশে জন্ম নিবে এবং নিজেদের মহান চরিত্র দ্বারা লোকদের ইসলামের প্রতি আকর্ষণ করবে।** আর তাদের মনের রাস্তা দিয়ে লোকেরা পুনরায় ইসলামে প্রবেশ করতে আরম্ভ করে তাদের চোখের রাস্তা দিয়ে লোকেরা পুনরায় ইসলামের সৌন্দর্যসমূহ অধ্যয়ন করে। এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দাঈয়ানে ইলাল্লাহ্গণের প্রয়োজনীয়তা খুবই অনুভূত হচ্ছে। কিন্তু এ জাতির দাঈয়ানে ইলাল্লাহ্, যাদের কথা আমি বলছি, তাদের সাথে যেন তাদের চরিত্রের একটি সুন্দর আকর্ষণী শক্তি থাকে। কতক লোক ইহা বলে দেয় যে, আমাদের চরিত্র সঠিক আছে। আমরা নামায পড়ে থাকি, আমরা মিথ্যা কথা বলি না, আমরা কারও অধিকার খর্ব করি না আর ইহাই তবলীগ, কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। ইহা দূর করা আবশ্যক যে, কুরআন করীমে চরিত্রের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব বর্ণনা করা সত্ত্বেও সুন্দর বাচনকে প্রথমে রেখে দিয়েছে। **'ওয়া মান আহসানু ক্বওলাম মিম্মান দা'আইল্লাল্লাহ্** (এবং আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করার চেয়ে কার কথা সুন্দর) অথচ নির্বাক ভদ্রতার নাম নেয়া হয় নি। নবীদের যে ইতিহাস আমাদের নিকট উপস্থাপন করা হয়েছে এতে কোথাও নির্বাক ভদ্রতার উল্লেখ করা হয় নি। বরং প্রকৃত কথা এই যে, যদি ভদ্রতাকে দেখে আর তা নির্বাক হয় তাহলে বিরোধিতা ও মুখালেফাত শেষ হয়ে যেতে থাকবে আর লোকেরা এ সমস্যা সৃষ্টি করতে থাকবে যে, তোমরা ভদ্রতার জীবন-যাপন করো, কিন্তু মুখে কিছু বলবে না আমরা তোমাদেরকে কিছু বলবো না। সুতরাং দাওয়াতে ইলাল্লাহ্ কেবল চরিত্রের মাহাত্ম্য থেকে পূর্ণতা লাভ করে না। এজন্যে জিহ্বার সঠিক ব্যবহারও আবশ্যকীয়। আর এর ফলশ্রুতিতে ভদ্রতা বজায় থাকা সত্ত্বেও আবার মুখালিফাত আরম্ভ হয়ে যায় । কিন্তু যারা ভদ্র হৃদয়ের অধিকারী তাদের ওপরে ভদ্রতা জিতে যায় যা কিনা খারাপ কর্মানুষ্ঠানকারী লোক বা বক্র হৃদয়ের অধিকারী লোক তারা অন্তরের ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে যায়। কিন্তু মৌলিক কথা ইহাই যে, এমন সব দাঈয়ানে ইলাল্লাহ্দের আবশ্যক, যাদের জিহ্বায় সুন্দর কথা প্রতিষ্ঠিত ও প্রবাহমান থাকে আর সুন্দর কথা বুঝাতে গিয়ে আমি ইতঃপূর্বে অনেক কথা বলেছি। এতে দলিল-প্রমাণের কোন কথা নেই এতে কেবল সুন্দরভাবে কথা বলার বিষয়টি রয়েছে । অর্থাৎ এমনভাবে কথা বলা হয় যাতে প্রাণের আকর্ষণী শক্তি থাকে । সুতরাং কথায় প্রাণকে আকর্ষণকারী শক্তি থাকুক, কর্ম হোক উন্নত মার্গের ও সুদৃঢ় আর কর্ম এমন হোক যেন লোককে নিজের দিকে ঝুঁকে নিয়ে নেয় তাহলে বিশ্বের কোন শক্তি ইসলামের মোকাবেলা করতে পারে না। দু'টি শর্ত খোদাতাআলা আরোপ করে দিয়েছেন। এর পরে বলেছেন, যাও মাঠে সফলতা তোমাদের পদচুম্বন করবে। ঐ যে তোমাদের প্রাণের শত্রু, সম্মুখে অগ্রসর হয়ে এ আয়াত আরও বলেছে যে, তারা তোমাদের প্রাণের বন্ধুতে পরিণত হবে। কিন্তু আরও একটি শর্তের সাথে ইহাকে সংবদ্ধ করা হয়েছে যে, ধৈর্যকে সদা সাথে রাখতে হবে। যে লোক ধৈর্যের সাথে ঐসব কথার ওপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে অর্থাৎ সুন্দর সুন্দর কথা দ্বারা মনোমুগ্ধকর কথার মাধ্যমে লোকদের নিজের দিকে আকর্ষণ করতে থাকবে আর তার কর্ম তার কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে না এবং শক্তি প্রদানকারী হবে তার জন্যে এ শুভ সংবাদ যে, যদি সে ধৈর্যের সাথে ইস্তেকামত (সুদৃঢ় হয়ে থাকা)-এর সাথে এ পদ্ধতির ওপরে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে থাকে তাহলে তার জন্যে সফলতাই সফলতা এবং শত্রুর প্রসঙ্গে অবশ্যই বলেছেন যে, তাদের কথা ও উত্তম কর্ম দেখা সত্ত্বেও শত্রুরা শত্রুতা করে থাকে। তিনি (আল্লাহ্) বলেছেন, উহার ওপরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও শত্রুদের মধ্যে পরিবর্তন নিয়ে আসা আমার কাজ আর আমরা শত্রুদের হৃদয়ে করুণার প্রস্রবণ প্রস্ফুটিত করে দেবো এমনকি ঐ সব লোক যারা তোমাদের রক্ত-পিপাসু ছিলো তোমাদের জন্যে রক্ত ঝরাতে নিজেরা গর্ব অনুভব করবে-কতই না মহান বাণী! এবং কত সংক্ষিপ্ত কথায় খোদাতাআলা এ গোটা বিষয়-বস্তুকে যা কিনা সমুদ্রতুল্য একটি কুঁজোর মধ্যে বন্ধ করে দিয়েছেন। সুতরাং দাঈয়ানে ইলাল্লাহ্দের জন্যে ইহা আবশ্যক যে, সত্ত্বর তারা তাদের কর্মের ব্যাপারে আত্ম-বিশ্লেষণ করে এবং তাদের কথা বলার ঢং-এরও বিশ্লেষণ করে। অনেক মুবাল্লিগকে আমি দেখেছি যারা সারা জীবন তবলীগ করে কাটিয়েছেন কিন্তু তাদের কথা খোঁচা মারা হয়ে থাকে। তারা পরে যদি কোন কড়া কথা শুনতে পায় বা কথার মধ্যে ক্ষিপ্রতা সৃষ্টি হয় তখন তারা মনে করে যে, **শত্রুকে হাড়িয়ে দেয়া আমাদের কাজ ; যদিও শত্রুকে পরাজিত করা অবশ্যই কাজ নয়। শত্রুর মন জয় করা আমাদের কাজ।** *"ফাইযাল্লাযী বায়নাকা ওয়া বায়নাহু আদাওয়াতুন কাআন্নাহু ওয়ালীউন হামীম"*- অর্থাৎ ফলে সহসা ঐ ব্যক্তি, যার মধ্যে আর তোমার মধ্যে শত্রুতা রয়েছে অন্তরঙ্গ বন্ধুর ন্যায় হয়ে যাবে (৪১ঃ৩৫)। খোদাতাআলা তবলীগের এই উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর ইহা কতই না বিরাট উদ্দেশ্য! ইহা বলেন নি যে, পরে তোমরা শত্রুকে পরাজিত করার পরে পরাজিত করে যেতে থাকো। বলেছেন যে, পুনরায় ইহা হবে এবং ইহা হতেই হবে যে, কঠোর শত্রুও তোমাদের ভালবাসার পাত্র ও প্রাণের বন্ধুতে পরিণত হবে। যাকে আপনি বন্ধু বানাতে চান তাকে কর্কশ কথা দ্বারা বন্ধু বানানো যেতে পারে না। ঘরে আমি শিশুদের মধ্যে দেখেছি, যখন কথা-বার্তা চলতে থাকে যদি কোন শিশু অপর এক শিশুর সাথে কর্কশ কথা বলে তখন অন্যজনও কর্কশ ভাষায় জবাব দেয়, এমন কি কখনও ঝগড়া-বিবাদ আরম্ভ হয়ে যায়। একে অপরকে হাতের নাগালে যা পায় তাই দিয়ে মারতে আরম্ভ করে। তাই যে লোক প্রথম থেকেই আপনার প্রাণের শত্রু তার সাথে আপনি কর্কশ ভাষায় কি করে প্রতিযোগিতা করবেন। তার মধ্যে যে মন্দ প্রবণতা রয়েছে ওগুলোতে আপনি আরও আগুন লাগিয়ে দিবেন তার মধ্যে বিরোধিতার যে তেল রয়েছে উহাকে ম্যাচের কাঠি দিয়ে জ্বালাবেন। এজন্যে কুরআন করীমে খুবই সুন্দর ও খুবই পরিপূর্ণ কথায় বলেছে। বলেছে, এসকল কিছু করো কিন্তু উদ্দেশ্য ইহাকে দৃষ্টি পটে রাখতে হবে যে, তোমাকে শত্রুর মন জয় করতে হবে এবং সুন্দর সুন্দর কথা এসব কিছুর পরিচিতিই বহন করে। সুন্দর সুন্দর কথা বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে, তোমরা বিতর্কে জয় লাভ করে ফেলো,

বিতর্কে জয় লাভ করার ফলশ্রুতি দ্বারা অন্তরকে অবশ্যই জয় করা হবে বুঝায় না। কখনও কখনও বিরোধিতাকে বাড়িয়ে দেয়। কখনও কখনও শত্রু মাথা হেঁট হয়ে গেছে বলে মনে করে। নিজেকে নিজে লাঞ্ছিতও মনে করতে থাকে এবং প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বিরোধিতাকে আরও বৃদ্ধি করে দেয়। (আল্লাহ্) বলছেন, তোমাদের কথা বলার ভঙ্গী সুন্দর হওয়া উচিত অর্থাৎ মন যেন জয় করা যায় এমন কথা, আর কর্মের ব্যাপারে তো আগেই আমি বলে দিয়েছি। **ওয়া আমালা সলিহান** অর্থাৎ যেসব কর্ম সুন্দর হয়। তাই কথার মধ্যে না কেবল ইহাই থাকে যে, অধিক সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় বরং ভাব-গাম্ভীর্যও সৃষ্টি হয়, ইহা ছাড়া সুন্দর কথা শাসবিহীন হয়ে থাকে, এর মধ্যে আকর্ষণী শক্তি থাকে না। ব্যক্তিগতভাবে আমাদের প্রয়োজন তো আছেই কিন্তু এখন জাতিগতভাবে নুতন শতাব্দীর সাথে এত বিরাট বিরাট রাস্তা উন্মোচিত হচ্ছে যে, এখন কেবল এ প্রশ্ন নয় যে, আমাদের দরজা খুলি, **খোদাতাআলার অমোঘ নিয়তি লোকদের ও জাতিসমূহের মনের কপাটগুলো খুলে দিচ্ছেন**। আর এমন কতক জাতির সাথে জামাতে আহমদীয়ার সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়া আরম্ভ হয়েছে যাদের সাথে ইতঃপূর্বে দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র জন্যে কোন দরজা খোলা যায় নি। দাবী আসা আরম্ভ হয়েছে চীনের দিক থেকে, আমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টাগুলো তা না হলে কার্যকরী প্রমাণিত হতো না অথবা ফলদায়ক প্রমাণিত হতো না। ধারাবাহিকতার সাথে এসব লোকদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হচ্ছে, যাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক ছিলো না। কিন্তু এরও সূচনা একজন উত্তম আহমদীর উন্নত মার্গের চরিত্রের ফলশ্রুতি ছিলো। একজন চীনা অফিসার, এক চীনা স্কলার (পন্ডিত ব্যক্তি) দেশের বাইরে এসেছিলেন। একজন প্রফেসর দেশের বাইরে এসেছিলেন।এভাবে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। **তিনি এমন একজন আহমদীকে দেখেন। তাকে তিনি একটু ভিন্ন ধর্মী পান। আর তিনি এমন আহমদী ছিলেন যার ভদ্রতা নির্বাক ছিলো না বরং কথা বলতে পারতেন**। তার কাজ-কর্মে তিনি মুগ্ধ হন। তিনি কথায় কথায় তাকে বলতে আরম্ভ করেন যে, আমি কেন ভিন্নতর। আমাদের চারিত্রিক বিধি-বিধান রয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে যার আনুগত্যের ফলশ্রুতিতে তুমি আমার মধ্যে একটি পার্থক্য দেখতে পাচ্ছো। সুতরাং ইসলামের পরিচিতি আহমদীয়তের পরিচিতি আর উহা ফলস্বরূপ একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত যা আমার সমুখে রয়েছে। যেহেতু তিনি বড় মাপের প্রভাব সৃষ্টিকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। চীন থেকে সম্পর্ক সৃষ্টি করা আরম্ভ করেছেন। প্রথম প্রথম এসব সম্পর্ক নেতিবাচক ফল সৃষ্টি করলো এবং তাকে খুবই কড়াকড়ির সাথে এ নির্দেশ দেয়া হলো যে, সাবধান, কখনও এ দলের নিকটবর্তী হয়ো না। এতো খুবই মারাত্মক দল ! আর এরা হলো মুরতাদ। যেসব কথা তিনি শুনেছিলেন তা পুনরাবৃত্তি করতে থাকলেন। আমিও তার পিছু ছাড়লাম না। সুসম্পর্ক বজায় রাখলাম। আপনি এক পক্ষের কথা শুনে দমে যাবেন না। শত্রু কি করে থাকে। খোদাতাআলা হেদায়াতের পথে শয়তানকে লাগিয়ে রেখেছেন। সে ধ্বনি দিতে থাকে আর বলতে থাকে, ইহা সঠিক পথ নহে। এদিকে এস, এদিকে এস ! কানের মধ্যে কথা ফুঁকতে থাকে। অতএব পর্দা বা পিঠের পিছনে কথা বলতে থাকে এবং তাকে বলতে থাকে যে, অন্যদের সাথে কথা বলার কোনই আবশ্যকতা নেই। তুমি আমাদের কথা শুন এবং মনে করে নাও যে, এসব শয়তানীলোক। তাদের নিকটেও যাওয়া উচিত নয়। এজন্যে আপনি বই-পুস্তক অবশ্যই পড়ে নিন। তাদেরও সুযোগ দিন আমাদেরও সুযোগ দিন। সুতরাং কতক জিনিষ তাকে পাঠানো হয়। তিনি পাঠ করেন আর তার মনের চেহারা সর্বৈব বদলে গেলো। তিনি দ্বিতীয়বার যোগাযোগ করেন এবং এখন আমার নিকট এই খবর এসেছে যে, যোগাযোগের ফলশ্রুতিতে এসব লোকেরাও সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ করেছে এবং তাদের কতক প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দ তাকে লিখেছে যে, আমরা এখন যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি তাতে ইহা জানতে পেরেছি যে, ইহাই ঐ জামাত যা কিনা আসলে ইসলামের পতাকাবাহী আর আমাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ইহা ধরা পড়েছে যে, এই জামাতই শান্তিপ্রিয় এবং তরবারীর দ্বারা নয় বরং ভালবাসা দ্বারা ও বাণীর দ্বারা অন্তরকে জয় করার নীতি বহন করে এবং ইহা তাদের চরিত্র। এজন্যে আমাদের আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে এবং কতক লোক সেখান থেকে চেষ্টা করছে যে, যত সত্ত্বর সুযোগ আসে তারা এখানে আসে। কিছু দিন এখানে কাটায় এবং জামাতের ব্যাপারে আরও জ্ঞান লাভ করে। এমনিভাবে খোদাতাআলার ফযলে রাশিয়ায়ও যোগাযোগের দারোদ্‌ঘাটন হতে যাচ্ছে। আল্লাহ্‌তাআলা প্রথম থেকেই আমাদেরকে সৌভাগ্য দান করে আসছেন যে, এসব জাতির জন্যে যে পুস্তকাদির শূন্যতা ছিলো উহাকে পূর্ণ করা আরম্ভ করো। আর বর্তমানে খোদার আশীষক্রমে আমরা পূর্বাহ্নেই ঐ স্থানে দন্ডায়মান আছি। যখনই চাহিদা আসবে তাদেরকে কিছু না কিছু অবশ্যই পৌছানো হবে। বিশেষ করে তাদের ভাষায় কুরআন করীম। কেননা, এর চেয়ে শ্রেয়ঃ আর কোন পুস্তক সরবরাহ্ করা যেতে পারে না। সারা বিশ্বে কুরআনের চেয়ে শ্রেয়ঃ আর কোন পুস্তক নেই। তাই আল্লাহ্‌তাআলার আশিসক্রমে আমরা এ প্রসঙ্গে স্বয়ংসম্পুর্ণ হয়ে গেছি। অধিক সংখ্যায় প্রকাশিত হচ্ছে এবং স্টকও মজুদ আছে। এ ছাড়াও আরও পুস্তকাদি প্রণীত হচ্ছে। এসব বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। এদের সাথে যদি পরিচয় করানো যায় তাহলে এ প্রসঙ্গে আমি আপনাদেরকে বলছি, সুসংবাদ দিচ্ছি যে, বহির্দেশ থেকে দরজাসমূহ অবারিত হওয়া আরম্ভ হয়েছে এবং বাধাসমূহ দূরীভূত হচ্ছে, আপনারা আপনাদের অর্গলকে কেন সংকীর্ণ করে রাখবেন এসব উন্মুখ দরজাগুলোর সাথে সাথে আপনারাও যদি আপনাদের কপাটগুলোকে প্রশস্ত এবং ব্যাপকতর না করতে থাকেন তাহলে পরে ইসলামের বিস্তারের দায়িত্ব আপনারা পালন করলেন না এবং সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাদের আল্লাহ্‌র নিকট জবাবদেহী করতে হবে। যেভাবে আমি বলেছি যে, কবাট খোলার অর্থ এই যে, আমাদের Points of contact (যোগাযোগের মাত্রা) ব্যাপকতর হয়। অর্থাৎ এতদ্ব্যতিরেকে যে, এক মুবাল্লিগ বা দশ বা শ' মুবাল্লিগ বা শ' দাঈয়ানে ইলাল্লাহ্ বা হাজার দাঈয়ানে ইলাল্লাহ্ ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত রাস্তায় পরিণত হয় এবং ইসলামের জন্যে লোকদের প্রবিষ্ট করাবার জন্যে নিজেদের অন্তরকে উপস্থাপন করে লক্ষ-সংখ্যায় প্রয়োজন আর হাজার স্থানে এসব সংযোগ স্থাপন বৃদ্ধি করা আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে আমি পূর্বেও বার বার বলেছি যে, আমাদের এসব জাতির প্রতি দেশের বাইরেও দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক। দেশগুলোর যে কবাটগুলো খোলা হয়েছে আর আল্লাহ্‌র আশিসক্রমে খুলছে, এগুলোর সাথে তো আমরা জামাতী ও ব্যবস্থাপনার পর্যায়ে যোগাযোগ করবো এবং যতটা সৌভাগ্য লাভ হয় এ যোগাযোগকে প্রভাবশালী বানাবে। কিন্তু যখন আমি বলি যে, জাতিসমূহের অর্গল উন্মোচিত হচ্ছে তখন এর অর্থ এই যে, এমন সব অর্গলও রয়েছে যা কিনা এসব দেশের বাইরে অবস্থিত। কোটি কোটি চীনা লোক দেশের বাইরে জীবন অতিবাহিত করছে। আর লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় রাশিয়ার লোক হবে বা পূর্ব কমিউনিষ্ট বিশ্বের লোক, লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় নিজেদের দেশের বাইরে বসবাস করছে। এজন্যে যে প্রবণতা সেখানে সৃষ্টি হচ্ছে, এথেকে অধিক প্রবণতা এসব দেশের বাইরে সৃষ্টি হওয়ার বুদ্ধিবৃত্তিক সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথমেতো যখন আপনি চীনের সাথে সম্পর্ক রাখেন এমন চীনার সাথে কথাবার্তা বলছিলেন তখন এ ভয় তার ঘাড়ে চেপে বসেছিলো যে, যদি ইহা সত্যও হয় আর আমি ইহা গ্রহণ করেও নিই তাহলে আমার দেশ ইহাকে সহ্য করবে না। একজন রাশিয়ার লোককে যখন আপনি তবলীগ করবেন তখন সে-ও

ভীত হবে। আমার মনে আছে, কলেজ জীবনে দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরে যখন আমি নিউ হোষ্টেলে থাকতাম, একটি রাশিয়ান প্রতিনিধি দল আগমন করে। আমরা কতিপয় আহমদী ছাত্র মিলে তাদের মাঝে বই-পুস্তক বিলি করার জন্যে গেলাম। আমাদের সাথে রাশিয়ান ভাষায় বই-পুস্তক তো ছিলো না। কিন্তু ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষায় পুস্তকাদি ছিলো। যেহেতু, তারা ইংরেজী জানতেন, ওগুলো তাদেরকে দিলাম। আমরা সবাই অনুভব করলাম যে, তারা ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। তাদের সাথে তাদের সহকারী হিসেবে আরও এক ব্যক্তি । হতে পারে তিনি গোয়েন্দা সংস্থার লোক ছিলেন। কেননা, এদিনগুলোতে বিশেষ করে যখন রাশিয়ান প্রতিনিধিদল বাইরে যেতো তখন তাদের সাথে গোয়েন্দা অফিসার অবশ্যই যেতো। এখন তুলানামূলকভাবে অনেক কম। তারা তার প্রতি তাকালো। তাদের চোখে ভীতি ছিলো। তারা বই না নেয়ার জন্যে অপরাগতা প্রকাশ করলেন। তাদের তুলনায় অন্যান্য অনেক লোক বই-পুস্তক নিলেন। যতটা আমার মনে আছে রাশিয়ানরা হয় গ্রহণ করেন নি অথবা ঝট্‌পট্ করে আগ্রহবশতঃ এক আধখানা নিয়ে থাকবেন। আমার তো ইহাই মনে আছে যে, তারা গ্রহণ করেন নি। এখন তারা গ্রহণ করেন। এখন দাবী করেন যে, এখন যেখানে যেখানে রাশিয়ান রাষ্টদূত থাকেন, আমাদের বন্ধুরা যোগাযোগ করেছেন তারা গভীর আগ্রহের অভিপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। আফ্রিকা সফরের সময়ে এসব এম্বেসীর একজন দূত তো ছিলেন না, একজন সিনিয়র অফিসার ছিলেন বা ডেপুটি সিনিয়র অফিসার ছিলেন। তিনি আগেই আমাদের প্রকাশিত কুরআন করীম পেয়েছিলেন। খুব প্রশংসা করলেন, এতো উন্নত মানের অনুবাদ যে, মনের ওপরে গভীর দাগ কাটে। তাই রাশিয়ান হোক বা চীনা অথবা তারা এসব দেশে বসবাসকারী হোক সেখানে আমাদের প্রবেশাধিকার ছিলো না এবং এখনও পুরোপুরি সম্ভবপর হয় নি তবে তাদের গোষ্ঠি-জ্ঞাতি যারা বাইরে বসবাস করছে তাদের নিকট তো আপনারা পৌছুতে পারেন। অনেক আহমদী এমন আছেন যাদেরই সৌভাগ্য হয়, এসব এলাকার বাইরের আহমদীদের তাদেরকে নিজেদের মিশনস্বরূপ বানানো উচিত যেন তাদের মাধ্যমে এসব জাতির মধ্যে ইসলামের তবলীগে প্রবৃদ্ধি ঘটে। আর আমরা ঐ কবাটে পরিণত হই যদ্বারা তারা ইসলামে প্রবেশ করে। অতএব এভাবে ইসলামের কবাট ব্যাপকতা লাভ করবে এবং যত অধিক আহমদী এতে অংশ গ্রহণ করবে ততই এতে ব্যাপকতা সৃষ্টি হতে থাকবে। এ প্রসঙ্গে আরও একটি আবশ্যকীয় উপদেশ এই যে, এর আগেও করেছিলাম, কিন্তু বন্ধুরা সাধারণতঃ ভুলে গিয়ে থাকেন, এজন্যে কতক উপদেশ বারে বারে করতে হয়। ঐসব নিষ্ঠাবান, ঐ সব সৌভাগ্যশালী আহমদী যারা আগামী শতাব্দীতে নিজেদের সন্তানকে ইসলামের জন্যে উপহার হিসেবে উপস্থাপন করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন তারা অনেক সময়ে আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে, আমরা এদের কীভাবে গড়ে তুলবো ? তাদেরকে বুঝানোর জন্যে, তাদেরকে পদ্ধতি শিখাবার জন্যে তাদের আরও পথ-নির্দেশনার জন্যে, যথারীতি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে দেয়া হয়েছে। আর তাহরীকে জাদীদকে আমি বুঝিয়ে দিয়েছি যে, কী প্রকারের পুস্তকাদি তৈরী করতে হবে। পিতা-মাতার প্রতি কোন্ প্রকারের প্রশিক্ষণমূলক উপদেশাদি প্রণীত হওয়া উচিত। শিশুদেরকে তো তারা প্রশিক্ষণ দিবেন। আমাদের পিতা-মাতাকে তো এখনই পথ-নির্দেশনা দেয়া দরকার। তারা ইনশাআল্লাহ্ তদনুযায়ী কাজ আরম্ভ করে দেবেন। সত্ত্বর তাদের ইহাও বুঝানো দরকার যে, এসব শিশুদের জন্যে দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিসেবে বই-পুস্তক তৈরী করা দরকার এবং বিভিন্ন ভাষায় তৈরী হওয়া দরকার যেন প্রারম্ভ থেকেই যেভাবে আমরা প্রশিক্ষণ দিতে চাই তাদের ঘরে ঐ রকম প্রশিক্ষণ আরম্ভ হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে আমি এই উপদেশ দিয়েছিলাম যে, **যেসব ওয়াকেফীনে নও পিতা-মাতার ঘরে কন্যা জন্ম গ্রহণ করেছে তাদেরকে কী শিখানো হবে ?** মেয়েদের জন্যে উহা সহজসাধ্য নয় যা কিনা ছেলেদের জন্যে সম্ভব। তাদেরকে কর্মক্ষেত্রের যেখানে সেখানে রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে কিছু চাহিদা রয়েছে, আবার তাদের কিছু প্রাকৃতিক চাহিদাও রয়েছে যার প্রতি দৃষ্টি রেখে তাদের কাছ থেকে আমরা এভাবে কাজ নিতে পারি না যেভাবে প্রত্যেক ওয়াকফে নও ছেলের নিকট থেকে কাজ নিতে পারি। এজন্যে আমি তাদেরকে বলেছিলাম যে, এসব শিশুদের শিক্ষার অঙ্গণে আগে নিয়ে আসুন। শিক্ষা সম্পর্কিত কাজ-কর্ম শিখান। আর জ্ঞান তো বাড়াতেই হবে। কিন্তু শিখাবার পদ্ধতিগত ব্যবস্থাপনা রয়েছে যাকে বি, এড বা এম, এড বলা হয়ে থাকে, এমন সব ডিগ্রী যাতে শিখাবার পদ্ধতি শিখানো হয়ে থাকে এতে তাদের ভর্তি করিয়ে দিন। ভবিষ্যতে যখন বড় হবে তখন তাদেরকে এসব শিখানো হবে। কিন্তু এখন তাদের এই রঙ্গে প্রশিক্ষণ আরম্ভ করে দেয়া দরকার। আবার ডাক্তারদেরও প্রয়োজন আছে। মহিলা ডাক্তারদের খোদাতাআলা সৌভাগ্য দান করলে অনেক বড় সেবা দান করতে পারে এবং খুব গভীর প্রভাব সৃষ্টি করা যেতে পারে। এ পথেও তারা ইসলামের বাণী প্রচারের কাজে অন্যদের ওপরে প্রাধান্য সৃষ্টি করতে পারে। এজন্যে আহমদী মহিলাদের ডাক্তার হয়ে নিজের জীবন উপস্থাপন করা উচিত বা এসব শিশুদের ডাক্তার বানানো হোক যারা খোদাতাআলার আশিসক্রমে ওয়াকফে নও হিসেবে জন্ম গ্রহণ করেছে। এভাবে আমি ভাষার ব্যাপারেও বলেছিলাম। আর যেসব ভাষার আমাদের প্রয়োজন হবে তন্মধ্যে রাশিয়ান ও চীনা ভাষা খুবই গুরুত্ব বহন করে। জামাতে আহমদীয়ার মধ্যে যেসব ভাষায় কম্‌তি রয়েছে এর মধ্যে দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি হলো স্পেনিশ ভাষা। এর দিকে দৃষ্টি দেয়া আরম্ভ হয়ে গেছে। খোদাতাআলার আশিসক্রমে ফ্রান্সীস ভাষায় আফ্রিকার অনেক লোক আমাদের রয়েছে যারা ফ্রেন্স ভাষায় কথা বলে থাকেন। সেখান থেকে অনেক উত্তম ফ্রান্সীস ভাষায় কথা বলার লোক মিলতে পারে আর পাওয়াও যাচ্ছে খোদাতাআলার আশিসক্রমে। কিন্তু চীনা ভাষায় ও রাশিয়ান ভাষায় আমাদের অনেক কম্‌তি আছে বলে আমি মনে করি। এভাবে ইটালিয়ান ভাষায়ও কম্‌তি আছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে সবচেয়ে অধিক প্রয়োজন ও সবিশেষ প্রয়োজন চীনা ও রাশিয়ান ভাষা জানেন এমন আহমদীদের। এজন্যে যেখানে ঐ সকল যুবক যাদের এ সুযোগ রয়েছে তারা যেন শিক্ষা বিভাগের প্রতি দৃষ্টি দিতে পারে, তাদের প্রতিও আমার এ উপদেশ যে, তারা যেন দৃষ্টি দেয়। কিন্তু **যারা ঐ সব দেশে জন্ম নিয়েছে যেখানে চীনা ও রাশিয়ান ভাষা শিক্ষা করার সুযোগ রয়েছে তাদের শৈশবকাল থেকেই এ ভাষাগুলো শেখানো আবশ্যক।** আর তাদের জন্যে এম্বেসীর সাথে যোগাযোগ করে কিছু ক্যাসেট প্রভৃতি যদি সংগ্রহ করা যায়, ভিডিও সরবরাহ্ করা যেতে পারে। শিশুদের ছোট ছোট গল্পের বই প্রভৃতি শিখানো হয় তাহলে উহা মস্তিষ্কে এত গভীর ভাবে দাগ কাটে যে, এর পরে শিশুরা ঐসব ভাষা-ভাষীদের মত বলতে পারে। আর বড় হয়ে গেলে ভাষা শিখাবার জন্যে আপনি যতই চেষ্টা করুন না কেন মাতৃভাষায় যারা কথা বলে তাদের মত করে বলতে পারবে না। প্রকৃতি ও স্বভাবগতভাবে মেধা যেভাবে চিন্তা করতে পারে উহা শৈশব কাল থেকে যদি ভাষা শিখানো হয় তাহলে ঐ চিন্তা করতে তার জন্যে কষ্টকর হয় না। উহা হয় স্বভাবগত ও প্রাকৃতিক কিন্তু যদি পরে ভাষা শিখানো হয় তাহলে চিন্তা-শক্তিতে কিছু না কিছু প্রতিবন্ধকতা ও কিছু না কিছু বাধ্যবাধকতা থেকে যায় এবং সাবধানে পদবিক্ষেপ সম্মুখে রাখতে হয়। কতকলোক তুলনামূলকভাব ক্ষিপ্রতার সাথেও আগে অগ্রসর হয়। কতক আস্তে আস্তে কিন্তু যা প্রকৃতিগত ও স্বভাবগত প্রবাহ উহা সৃষ্টি হতে পারে না। এজন্যে ভাষায় ওপর দক্ষ করতে হলে খুব শৈশব থেকেই ভাষা

শেখানো প্রয়োজন। **যদি দোলনায় থাকা অবস্থায় ভাষা শিখানো যায় তাহলে ইহাও খুবই ভাল- বরং সবচে' ভাল।** এমন দাঈমা যদি পাওয়া যায়, নার্স পাওয়া যায় এবং যাদের নার্স রাখার সামর্থ্য আছে তারা যেন তা রেখে নেয়। যদি চীনা নার্স হয় তাহলে শিশুদের শৈশবে কোলে নিয়ে খেলতে খেলতে চীনা ভাষা শিক্ষা দিতে পারে। রাশিয়ান যার মাতৃভাষা এমন মহিলা নার্স যদি পাওয়া যায় তাহলে তার নিকট শিশুকে সোপর্দ করা যেতে পারে। ইহাতো সামর্থ্য থাকার সাথে সম্পর্কিত বিষয়। কিন্তু যাদের সামর্থ্য আছে তাদের শিশুদের বাল্যকাল থেকেই রাশিয়ান ও চীনা ভাষা শিক্ষা দেয়ার চেষ্টা করা আবশ্যক। এ ব্যাপারে আমি কোন বাধ্যবাধ্যকতা আরোপ করছি না যে, আমাদের ১০০জন প্রয়োজন বা ১০০০ জন প্রয়োজন। আসল কথা এই যে, এরা এত বিরাট জাতি এবং বিশ্বে তাদের এতবড় মর্যাদা লাভ হয়েছে যে, যদি এরা উভয়েই উদাহরণস্বরূপ পার্থিব দিক দিয়ে একত্রিত হয়ে যায় তাহলে সারা বিশ্বে ক্ষমতার ভারসাম্য বিঘ্নিত হয় অর্থাৎ তারা যদি এক দিকে হয়ে যায়, আর অবশিষ্ট বিশ্ব তাদের বিরোধী পক্ষ হয়ে যায় তবে অনেক রাজনৈতিক পরিবর্তনসমূহ সাধিত হয়। বর্তমানে তাদের পৃথক পৃথক থাকাটাই কোন কোন জাতির জন্যে সৌভাগ্যের বিষয়। আর তারা শক্তি প্রয়োগ করে ও অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে এ সৌভাগ্যকে দীর্ঘস্থায়ী করার চেষ্টা চালায়। আবার কখনও কখনও ভুল করে এবং উল্টো ফল ফলে। কিন্তু আমাদের সাথে যতটা সম্পর্ক তাদের যুদ্ধ করাতে বা যুদ্ধ না করাতে আমাদের শত্রুতা বা বন্ধুত্বতে কোন ইতর বিশেষ হয় না। ইসলাম উভয়ের জন্যেই সমান। আর আমাদের ইসলামের যে বাণী পৌঁছাতে হবে এজন্যে আমাদের ভাষাবিদের প্রয়োজন। প্রত্যেক প্রকারের ভাষাবিদের আবশ্যক। যারা লেখায় পারদর্শী, বলায় পারদর্শী, অনুবাদ করার ক্ষমতা রাখে, রচনা করার যোগ্যতাও রাখে এজন্যে যত লোকই হোক না কেন তা স্বল্প। অর্থাৎ ১০০ কোটির কাছাকাছি বা এথেকে বেশী হলো চীনের জন সংখ্যা। আর রাশিয়া ও রাশিয়ান ভাষা জানা লোকও খুবই বহুল সংখ্যায় রয়েছে। এখন আমার পুরোপুরি তো স্মরণ নেই কিন্তু ৫০ কোটি থেকে অধিক হবে যারা রাশিয়ান ভাষা জানে এবং বলে। যদি সমস্ত ওয়াকেফীনও এই ভাষা শিখে নেয় তাহলে উহা বেশী হবে না। পুরুষদেরও শিখান শিশুদেরকে শিখান কিন্তু বালিকাদের বিশেষভাবে শিখান। কেননা, **লেখা-পড়ার কাজে আমাদের ওয়াকফে নও বালিকারা অনেক কাজে আসতে পারে।** তাদের মাঠেও যেতে হবে কিন্তু তারা রচনার কাজ করবে। তারা ঘরে বসে এ ধরনের কাজ করতে পারে যে, তাদের স্বামীদের নিকট থেকে তাদের পৃথক হওয়ার আবশ্যকতা নেই। এজন্যে তাদের এমন সব কাজ শিখানো বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। বালকদেরতো আমরা শামলিয়ে নেবো। আমরা তাদেরকে জামেয়াতে ভর্তি করাবো। বিশেষ কোন দেশ তাদের জন্যে নির্ধারণ করা হবে। তাই এ ভাষার ওপরে তাদের পারদর্শী বানানোর চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু বালিকাদের ওপরে আমাদের এমন এখতিয়ার হতে পারে না আর উপযুক্তও নয় আর ইসলাম এর অনুমোদন দেয় না যে, এভাবে শৈশবকাল থেকে তাদের পৃথক করে পুরোপুরি জামাতী ব্যবস্থাপনার অধীনে নিয়ে আসা হয়। এজন্যে শৈশবে অবশ্যই পিতা-মাতার অধিকার প্রতিষ্ঠিত থাকবে বা পরে স্বামীর অধীনে। এজন্যে **তারা যদি ভাষাগুলো শিখে নেয় তাহলে ঘরে বসে খুবই স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে সেবা প্রদান করতে পারে।** আর যখন ভাষা শিখা হয়ে যাবে তখন যে সময়ে তাদের মধ্যে যোগ্যতা সৃষ্টি হয় তাদেরকে আবার এসব **ভাষায় টাইপ করাও শিখাতে হবে এবং এসব ভাষার সাহিত্যও তাদেরকে পড়াতে হবে।** তারা ইহা মনে না করে যে, ভাষা বলতে পারলেই যথেষ্ট হয়ে যায় অথবা লেখা-পড়ার পদ্ধতি শিখা হলে ইহা যথেষ্ট হয়ে যায়। বই-পুস্তক যতই পড়া হয় ততই ভাষায় দক্ষতা সৃষ্টি হয়। এজন্যে আবার বেশী বেশী সংখ্যায় তাদের রাশিয়ান ক্লাসিকাল নভেল পড়াতে হবে। রাশিয়ান ক্লাসিকাল প্রবন্ধ, ক্লাসিকাল কবিতা, আধুনিক কবিতা এবং চীনা ভাষায়ও এ কথা খাটবে যেন বাল্যকাল থেকেই তাদের জ্ঞানের পাল্লা এতই ভারী হয় যে, খুবই সহজে এক স্বভাবজ আবেগে স্বয়ং শিক্ষার কাজে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকে। আমি আশা রাখি যে, জীবন উৎসর্গকারীগণ এ বাণীকে ভালভাবে মনে গেঁথে নিবে আর শেষ কথা এই যে, আবারও বলছি তাদেরকে মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী করা সম্পর্কে এখন থেকেই প্রচেষ্টা আরম্ভ করে দেয়া দরকার। **প্রকৃতপক্ষে বাল্যকাল থেকেই ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। যদি দেরী হয়ে যায় তাহলে খুবই পরিশ্রম করতে হয়।** কথায় বলে, লোহা গরম থাকতে থাকতে বাঁকানো উচিত। কিন্তু এই যে শৈশবের লোহা ইহা খোদাতাআলা দীর্ঘ দিন পর্যন্ত নরমই রাখেন আর এই যে কুঁড়ি অবস্থায় এর ওপরে যে নক্শা আপনারা খোদাই করতে চান উহা স্থায়ী হয়ে যায়। এজন্যে ইহা হলো তরবীয়তের সময়কাল আর তরবীয়তের সাথে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, **পিতা-মাতা যতই চান কথা দ্বারা তরবীয়ত করতে পারেন। যদি তাদের ব্যক্তি-সত্তা ও চরিত্র কথানুযায়ী না হয় তাহলে শিশু দুর্বলতাকে গ্রহণ করবে এবং সুদৃঢ় অংশ পরিত্যাগ করবে।** ইহা দু'টি প্রজন্মের সংযোগ কালে এমন একটি নীতি যার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের ফলশ্রুতিতে জাতিসমূহ বিনাশ প্রাপ্ত হতে পারে আর, ইহা স্মরণ রাখার ফলশ্রুতিতে উন্নতিও করতে পারে। এক প্রজন্ম যখন ভাবী প্রজন্মের ওপরে প্রভাব বিস্তার করে থাকে এর মধ্যে সাধারণতঃ এ নীতি কার্যকরী হয়ে থাকে। শিশু পিতা-মাতার দুর্বলতাকে গ্রহণ করতে ক্ষিপ্রতা অবলম্বন করে, তাদের কথার প্রতি কম দৃষ্টিপাত করে থাকে। যদি কথা বড় বড় কাজের হয় আর মধ্যিখানে দুর্বলতা থাকে তাহলে শিশু মাঝখানের দুর্বলতাকেই গ্রহণ করবে। এজন্যে স্মরণ রাখা উচিত যে, শিশুদের তরবীয়তের জন্যে আপনারা অবশ্যই নিজেদের তরবীয়ত করুন। এসব শিশুদের আপনারা ইহা বলতে পারেন না যে, ব্যস! তোমরা সত্য কথা বলো, তোমাদের মুবাল্লিগ হতে হবে। তোমরা অবিশ্বস্ততার কাজ কোর না, তোমাদের মুবাল্লিগ হতে হবে। তোমরা পরচর্চা কোর না, তোমাদের মুবাল্লিগ হতে হবে। তোমরা ঝগড়া-বিবাদ কোর না, আর এসব কথা বলার পরে মা-বাবা এমন ঝগড়া-বিবাদ, আবার এমন নোংরা কথা-বার্তা একে অপরের বিপক্ষে বলতে থাকে, এমন অসম্মানী করে যেন তারা বলে যে, শিশুদের তো আমরা উপদেশ দিয়েই দিয়েছি এখন আমরা নিজেদের ইচ্ছেমত জীবন যাপন করি- ইহা হতে পারে না। তাদের জীবনও যেমন শিশুদের জীবনও তেমনই। যে অলীক জীবন তারা রচনা করেছে যে, ইহা করো। শিশুদের এমন পিতা-মাতার প্রতি এক কানা-কড়িও পরওয়া নেই, যারা নিজেরা মিথ্যে কথা বলে। তারা যতই শিশুকে বলে যে, যখন তোমরা মিথ্যে কথা বলো তখন আমাদের কষ্ট হয়। তোমরা খোদার জন্যে সত্য কথা বলো সত্যতার মধ্যেই জীবন। এক্ষেত্রে শিশু বলবে, একথা তো ঠিকই। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তারা মনে করে যে, মা-বাবা মিথ্যেবাদী আর তারা অবশ্যই মিথ্যা কথা বলেন। এজন্যে দু'টো সংযোগকে প্রতিষ্ঠিত করার সময় এই নীতি কার্যকরী হয়ে থাকে এবং ইহার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করার কারণে আপসে শূন্যতা সৃষ্টি হয়ে যায়। যেসব ইউরোপীয় দেশে আমি বেড়াতে গিয়েছি সকলেই এই অভিযোগ উত্থাপন করে যে, আমাদের প্রজন্ম ও ভবিষ্যত প্রজন্মের মধ্যে একটি শূন্যতা সৃষ্টি হয়ে গেছে আর আমি তাদেরকে বুঝাবার চেষ্টা করেছি যে, এ শূন্যতা তোমরাই সৃষ্টি করেছো। তোমরা মৌখিকভাবে উত্তম চরিত্র শেখানোর চেষ্টা করেছো, তোমরা মৌখিকভাবে তাদেরকে উত্তম চরিত্রের

কথা বুঝানোর চেষ্টা করেছো। তোমরা বলেছো, যুবকদের এ ধরনের ধোঁকাবাজী করা ঠিক নয়। এভাবে তোমাদের এ আচরণ করা ঠিক নয়। কিন্তু তোমাদের জীবনে বাস্তবে তারা এসবই দেখছে যেগুলোর ওপরে সামান্য লেপন ছিলো কিছু দেখা যায় এমন চাদরে আবৃত ছিলো আর প্রকৃতপক্ষে এসব শিশু জানতো এবং বুঝাতো যে, তোমরা স্বয়ং এসব ব্যাপারে খুবই উৎসাহ বোধ করে থাকো। এজন্যে তারা তাতেই পরিণত হয়েছে যা কিনা তোমাদের অভ্যন্তরীণ চিত্র ছিলো, আর তোমরা যে শূন্যতা অনুভব করছো তোমাদের বাহ্যিক চিত্র থেকে তা অনুভব করছো। ঐ চিত্র যা তোমরা দেখতে চাচ্ছিলে এগুলোর মধ্যে তোমাদের যে ধ্যান-ধারণা ছিলো তা তোমাদের কর্মের বিশ্বে কোন সুফল প্রকাশ করে নি। এজন্যে তোমরা বাহ্যিকভাবে ইহাকে শূন্যতা মনে করছো যদিও ইহা পারস্পরিক ফলাফল- মন্দের পারস্পরিক ফলাফল। এর শীর্ষসমূহ উচ্চতর হতে যাচ্ছে বা যদি গভীরতর পরিভাষায় কথা বলো তাহলে ধ্বংসের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং আহমদী জামাতের ভাবী প্রজন্মসমূহের চারিত্রিক অট্টালিকা নির্মাণে সর্বদা এ নীতিকে মনে রাখতে হবে নচেৎ তারা সর্বদা ধোঁকায় পড়ে থাকবে এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের ওপর থেকে তাদের নিয়ন্ত্রণ দূর হয়ে যেতে থাকবে। তারা তাদের কথা মানবে না বিশেষ করে ওয়াকেফীনে নও শিশুদের ওপরে কঠিন দায়িত্বভার রয়েছে। এই যে পাঁচ হাজার বা অধিক শিশু যতই হোক না কেন এ পর্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে, তাদের আগামী বিশ্বকে শামলাতে হবে, ভবিষ্যত প্রজন্মকে তরবীয়ত ও প্রশিক্ষণ দিতে হবে। নতুন নতুন জাতির চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হবে এবং ইসলামের নব জীবনের জন্যে, বড় বড় সংগ্রাম করতে হবে বড় বড় মার্গ অতিক্রম করতে হবে। আপনি যদি এ বিষয়-বস্তুকে ভুলে গিয়ে সাধারণ অমনোযোগিতার অবস্থায় পূর্বতন জীবন যাপন করতে থাকেন তাহলে ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণকারী ওয়াকফে নওদের ওপরে আপনার কুপ্রভাবসমূহ ছেয়ে যাবে। এরপরে জামাত যতই চেষ্টা করুক না কেন তাদের সে রকম একটা সংশোধন করতে পারবে না। আমি দেখেছি জামেয়াতে যেসব কুঅভ্যাসগ্রস্ত শিশুরা আসে শিক্ষক অনেক জোর দেয়া সত্ত্বেও এসব কুঅভ্যাসের কিছু না কিছু থেকেই যায়, একেবারে মিটে যায় না। কুঅভ্যাসকে মিটানো খুবই কঠিন কাজ। একথা ঠিক যে, অভ্যন্তরীণভাবে কতক লোকের মধ্যে একবারে তাকওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায়। খোদা-ভীতি সৃষ্টি হয়ে যায়। পরে আবার এ অভ্যন্তরীণ শক্তির মাধ্যমে খোদার আশিসক্রমে নিজের সকল অনিষ্টকে নিক্ষেপ করতে পারে যদিও ইহাকে বিপ্লব বলা যেতে পারে। আমি এখন এমন বিপ্লবের কথা বলছি না। আমি তরবীয়তের নীতির কথা বলছি, যে পর্যন্ত তরবীয়তের সাথে সম্পর্ক রাখে, যদি আপনি এসব ওয়াকেফীনকে উত্তম অবস্থায় এবং সুস্থ স্বভাবসম্পন্ন অবস্থায় জামাতের সম্মুখে উপস্থাপন করেন তাহলে ইনশাআল্লাহ্ এ মণি-মুক্তা যোগ্যতার সাথে অতি মহান বিপ্লব সাধন করবে আর জামাত এদের দ্বারা বড় বড় মহান কল্যাণসমূহ লাভ করতে সক্ষম হবে। সাধারণতঃ বক্র স্বভাবাপন্ন শিশুও যদি আসে তাহলে কখনও কখনও ঐ বক্রতা বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ করে। কতক প্রাচীরে ছিদ্র সৃষ্টি হয়ে যায় উহা অগভীর হয়ে থাকে এবং ইঞ্জিনিয়ার দেখেন যে, বিপদের আশঙ্কা নেই। কিন্তু কতক গভীর ছিদ্র হয়ে থাকে আর উহা সময়ের সাথে সাথে ফাঁটতেও থাকে আবার ওগুলোর কারণে ছাদও ধসে পড়তে থাকে। তাই মৌলিক চারিত্রিক দুর্বলতাসমূহ ঐসব গভীর ছিদ্রের সাদৃশ্য হয়ে থাকে। যদি ওগুলোকে আপনি একবার সৃষ্টি হতে দেন তাহলে ভবিষ্যত প্রজন্মের ছাদ ধ্বংস করে দিলেন। এজন্যে খোদাকে ভয় করতে থেকে ইস্তিগফার পাঠ করতে করতে এ বিষয়-বস্তুকে খুব ভালভাবে মস্তিকে প্রোথিত করে নিন এবং হৃদয়ে গেঁথে নিন এবং আপনার চরিত্রে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করুন যেন আপনার এ পবিত্র পরিবর্তন ভাবী প্রজন্মের সংশোধন ও তাদের আধ্যত্মিক উন্নতির জন্যে সারের কাজ দেয় এবং ভিত্তিস্বরূপ কাজ করে যার ওপরে মহান অট্টালিকা নির্মিত হবে। আল্লাহ্তাআলা আমাদেরকে ইহার সৌভাগ্য দান করুন, তথাস্তু।

(তাহরীকে ওয়াকফে নও পুস্তক থেকে)

অনুবাদ- মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

দেশের প্রাচীনতম 'পাক্ষিক আহমদী'-এর অধিকাংশ কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে স্বেচ্ছা-সেবার ভিত্তিতে। ডাকে পত্রিকা প্রেরণ সংশ্লিষ্ট কাজে রত দারুত তবলীগের সদস্যবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।

কাদিয়ান-দারুল আমান

কাদিয়ানের ইতিহাস

আব্দুর রশীদ আর্কিটেক্ট, চেয়ারম্যান
ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব আহমদী আর্কিটেক্ট এন্ড ইঞ্জিনিয়ার্স

পটভূমি

সাধারণতঃ নগর ও শহর প্রসিদ্ধি লাভ করে উহাদের ভৌগোলিক অবস্থানের দরুন, সরকারী অফিস আদালতের দরুন, যাদুঘর থাকার দরুন, বা ঐতিহাসিক দিক থেকে খ্যাত ও স্থাপত্যের দিক থেকে গুণগত মানসম্পন্ন সুন্দর দালান কোঠা থাকার দরুন। কিন্তু কাদিয়ান ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত অমৃতসর শহরের নিকটবর্তী একটি ছোট গ্রাম হওয়া সত্ত্বেও ইহার খ্যাতি নজিরবিহীন। কারণ, ইহা এ যুগের সংস্কারক প্রতিশ্রুত মসীহ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর জন্মস্থান। তাঁর (আঃ) আবির্ভাব হয়েছিল পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর হাদীস মোতাবেক। কাদিয়ান আজ কেবল ভারত উপমহাদেশের লোকদের নিকটেই পরিচিত নয়, বরং ইহা বিশ্বের পাঁচটি মহাদেশে অবস্থিত লক্ষ লক্ষ আহমদী মুসলমানের হৃদয়ে বিশেষ সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত।

জানা যায় যে, কাদিয়ান ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। মির্যা হাদী বেগ এ অঞ্চলের প্রথম কাযী (সিটি ম্যাজিস্ট্রেট) ছিলেন। এ কারণে শহরটি কাযী রূপে পরিচিত হয়। মির্যা হাদী বেগ ছিলেন দর্শন বিষয়ে একজন পণ্ডিত ও নিবেদিত মুসলমান। ইসলামের জন্য ছিল তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। অতএব তিনি নূতন শহরের নামকরণ করেন ইসলামপুর কাযী। কালের বিবর্তনে ইহা কাযী মাজিতে পরিবর্তিত হয়। অতঃপর ইহা পরিবর্তিত হয় কাদি নামে। পরিবর্তনের এই ধারাবাহিকতায় অবশেষে ইহা কাদিয়ান নামে পরিচিত লাভ করে। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে রাজা রনজিৎ সিংহের আমলে কাদিয়ান ও তৎসংলগ্ন পাঁচটি গ্রাম নিয়ে গঠিত এলাকাটিকে প্রতিশ্রুত মসীহ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর পিতাকে ফিরিয়ে দেয়া হয়।

ঐ সময়ে এতদঞ্চলে কাদিয়ানের কোন গুরুত্বই ছিল না। আহমদীয়া জামাতের সুপরিচিত পণ্ডিত জনাব এ, আর দর্দ লেখেন, "কাদিয়ান কেবল ১০০০ লোকের বসতির একটি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। ইহা বস্তুতঃ পুরাতন কেল্লার চৌহদ্দির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। প্রাচীন কালে এই কেল্লার চারটি তোরণ ছিল। এগুলোর নাম ছিল নাংলি, মোরি, পাহাড়ী ও বাটালভী। এগুলো ব্যতীত আহমদ কর্তৃক গ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত কুপের নিকট কয়েকটি কক্ষ নির্মিত হয়। গ্রামের চতুর্দিকে ছিল মঠ ও উষর জনহীন প্রান্তর। বর্তমান মসজিদে নূরের নিকটে ছিল একটি প্রাচীন কূপ। কিন্তু লোকেরা অন্ধকারে ইহার কাছে যেতে ভয় পেত। বর্তমান দারুল আনোয়ার মসজিদের উত্তরে ছিল নেকড়ে কুকুর। বর্ষাকালে কাদিয়ান একটি দ্বীপে পরিণত হতো এবং তথার নৌকোয় যাওয়া সম্ভব হতো। সিভিল সার্জনকে স্বাস্থ্যকে রক্ষা বিষয়ক ব্যবস্থাদি প্রদান করতে অনুরোধ করা হয়েছিল, যদিও স্বাস্থ্য রক্ষার কোন ব্যবস্থাই ছিল না"।

(আহমদের জীবনী, পৃষ্ঠা ৫৯৭-এ আর দর্দ)

"কাদিয়ান ছিল কয়েকশ' লোকের একটি ছোট শহর। ইহা ছিল নিকটবর্তী রেল ষ্টেশন ও টেলিগ্রাফ অফিস থেকে এগার মাইল দূরে। এগুলো কাদিয়ানের সাথে যুক্ত ছিল একটি গর্তময় ধূলিধূসরিত রাস্তা দ্বারা। বহির্জগতের সাথে যোগাযোগের একমাত্র উপায় ছিল একটি সাব-পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে। শহরের সুযোগ-সুবিধা বলতে কিছুই ছিল না। এমনকি পানীয় জলের সরবরাহ ছিল অনিশ্চিত"।

(স্যার জাফরুল্লাহ্ কর্তক রচিত নূরুদ্দীন)

মোহনলাল নামক কাদিয়ানের একজন অমুসলমান পণ্ডিত নিম্নোক্ত ভাষায় তার মতামত ব্যক্ত করেনঃ

"মির্যা সাহেবের পূর্বে কাদিয়ানের অবস্থা ছিল খুব খারাপ। একজন মিষ্টি প্রস্তুতকারক বিক্রির জন্য দুধ নিয়ে আসত। সারা দিনেও সে এ দুধ বিক্রি করতে পারতো না। সন্ধ্যাবেলায় সে এই অবিক্রিত দুধ দধিতে পরিণত করতো। পরের দিন যখন সে এ দধিও বিক্রি করতে পারতো না তখন সে এই দধিকে পাকোরীতে পরিণত করতো। জনগণ সম্পর্ণরূপে অজ্ঞ ও অশিক্ষিত ছিল। কেবল মির্যা সাহেবের দরুন পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে বদলে গেল। এখানে এখন সব কিছু পাওয়া যায়। এখানে এখন পৃথিবীর সব দেশের লোক দেখতে পাবেন। আহমদীদের দরুন আজ আমরা সম্মানের পাত্র।"

যে অধ্যায়ের শুরু হয়েছিল মির্যা হাদী বেগের সময়ে তার পরিসমাপ্তি ঘটে ১৮৭৬ সালের জুনে মির্যা গোলাম মর্তুজার মৃত্যুর সাথে। নূতন প্রভাতের উদয় হলো। তখন কেউ ধারণাও করতে পারে নি কাদিয়ান সারা বিশ্বের ইসলামী কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে পরিণত হবে। কেউ কল্পনাও করে নি পাঞ্জাব প্রদেশের এক দূরবর্তী অজানা জায়গা হঠাৎ করে সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানরূপে আবির্ভূত হবে এবং ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হবে।

প্রাচীন কাদিয়ানের বিবরণ

কাদিয়ান ছিল এক অখ্যাত অজ্ঞাত স্থান, শহর ও জনবসতি থেকে অনেক দূরে। এমনকি ইহা বাটালার চৌহদ্দির মধ্যেও ছিল না। ইহা লাহোর নগরী হতে ৭০ মাইল দূরে। এর কোন গুরুত্বই ছিল না। ১৩১০ হিজরীতে যখন আবদুল্লাহ্ আথমের ঘটনা প্রসিদ্ধি লাভ করলো তার পূর্বে লোকেরা কাদিয়ানের অস্তিত্ব সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণরূপে অনবহিত। জিজ্ঞাসান্তে লোকেরা আমাকে জানালো যে, রাশিয়া সিমান্তের নিকট কোন একটি গ্রাম আছে। সেখানে একজন মৌলবী একজন ইংরেজের মৃত্যু সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে। ১৩১২ হিজরীতে যখন আমি কপুরথলা হয়ে বাটলায় পৌছলাম তখন আমি ডেরা বাবা নানক, কালনৌর, ভাগোয়াল, আলীওয়াল, লুংগেরওয়াল, পাংগারেইন, শ্রী গোবিন্দপুরা, হার্জুওয়াল ও ভামের নাম শুনতে পেলাম। কিন্তু কাদিয়ানের নাম শুনিনি। রেল ষ্টেশনে এককা গাড়ী ও ঘোড়ার গাড়ী চালকেরা যাত্রীর জন্য ডাকাডাকি করছিল। আমি* স্থানীয় কোর্ট, বাজার ও রেলষ্টেশনে কয়েকবার ঘুরাঘুরি করলাম। কিন্তু কেউ কাদিয়ানের নাম বলে নি।

*[টীকা ঃ এ বক্তব্য সম্ভবতঃ লেখকের নয়, অন্য কারো। কেননা, লেখক বর্তমান কালের লোক। মূল পুস্তকে মুদ্রণজনিত কোন ত্রুটি আছে বলে মনে হচ্ছে– সহকারী সম্পাদক]

ইতঃপূর্বে আমি কাদিয়ান সম্পর্কে বই পুস্তকে পড়েছিলাম। আমি **আনোয়ারুল ইসলাম** ও **নিশানে আসমানী** অধ্যয়ন করেছিলাম। এতে করে আমি ঈমানের আলো লাভ করেছিলাম এবং ইহা আমার চিন্তাকে সমৃদ্ধ করেছিল। মীর হাদী শাহ্ আমাকে কাদিয়ান আসার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন। বাটালা পৌছার পর আমি কাদিয়ানের রাস্তা খুঁজতে ছিলাম। একথা বলা অতিরঞ্জন হবে না যে, যখন আমি লোকদের নিকট কাদিয়ানের পথ জানতে চাইলাম তারা যেন অবাক হয়ে ধাঁধায় পড়ে গেল। তারা জানালো, এ নাম তারা শোনে নি। তবে কাদি নামে একটি ছোট গ্রাম আছে। তারা বললো, তুমি বরং থানায় যাও। তারা তোমাকে দিক-নির্দেশনা দিতে সমর্থ হতে পারে। বাটালায় আমি সকাল ৯টায় পৌছলাম। কিন্তু দুপুর ১২টা পর্যন্ত আমি কাদিয়ানের কোন পাত্তা খুঁজে পেলাম না। আমি এতই বিভ্রান্ত ও হতাশ হলাম যে, সিয়ালকোটে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তি আমার নিকট আসলো। সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো আমি কাদিয়ান যেতে চাই কিনা। আমি অত্যন্ত স্বস্তি বোধ করলাম ও উৎসাহিত হলাম। আমি তার নিকট থেকে দিক-নির্দেশনা চাইলাম। সে জিজ্ঞেস করলো, "আপনি কি মির্যা সাহেবের কাদিয়ানের কথা বলছেন"? সে আরো বললো, "লোকেরা ইহাকে কাদি বলে। আমি কাদিয়ানে বাস করি। মির্যা সাহেব কাদিয়ানের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। আপনাকে আমি সেখানে নিয়ে যাবো।"

সম্পূর্ণ আস্বস্ত হয়ে আমি তার এক্কাতে (ঘোড়ার গাড়ী) বসে পড়লাম। ঘোড়ার জন্য কিছু খাদ্য আনবে বলে সে বাজারে চলে গেল এবং বলে গেল শীঘ্রই ফিরে আসবে। দীর্ঘ সময় পরে সে ফিরে আসলো। বস্তুতঃ সে ঘোড়ার খাদ্য আনার জন্য নয়, বরং আরো যাত্রীর খোঁজে গিয়েছিল। প্রতিশ্রুত মসীহের পিছনে দাঁড়িয়ে জুমুআর নামায পড়তে চেয়েছিলাম। কিন্তু তা আমি হারালাম। যাহোক খোদাকে ধন্যবাদ। আমি কাদিয়ান পৌছলাম। এটা ১৩১২ হিজরীর কোন এক সময়ের কথা। আমরা যখন মোড়ের নিকট পৌছলাম তখন এক্কাওয়ালা আমাকে জানালো, এখানেই কাদিয়ান। প্রথমে আমার নজরে পড়লো সুন্দর মিনারাতুল মসীহ্ ও মসজিদে আকসার ছোট ছোট মিনারসমূহ। এ সময়কার আমার মনের অবস্থা একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন। আমি যার-পর-নাই স্বস্তি পেলাম, সন্তুষ্ট হলাম ও আরাম বোধ করলাম। আমার সকল অশান্তি ও ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। এখন কাদিয়ান পৌছানোই আমার একমাত্র কাজ।

যখন আমি কাদিয়ান পৌছালাম তখন আমি এর বহির্দেয়ালটি দেখতে পেলাম। যদিও এটি জরাজীর্ণ হয়ে গিয়েছিল তথাপি বহির্দেয়ালটি এর অতীত শান-শওকত ও আড়ম্বরের ইঙ্গিতে বহন করে। পরে আমি বুঝতে পারলাম শহরটি একটি প্রতিরক্ষাকারী প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। এর অবস্থা খারাপ। পূর্বে এর উচ্চতা কত ছিল তা বুঝার উপায় নেই। এখন ইহা ত্রিশ হতে বত্রিশ ফুট চওড়া এবং এর উচ্চতা আট হতে দশ ফুটের মধ্যে। আমি অনুমান করলাম, এই প্রাচীর প্রায় ১১০০ বাই ৯০০ ফুট এলাকাকে ঘিরে আছে। এই এলাকার চারকোণে চারটি তোরণ ছিল। এগুলো পাহাড়ী, বাটালভী, নাংলি ও মোরী নামে পরিচিত। এর চতুর্দিকে ছিল গভীর অরণ্য। এমনকি দিনের বেলায় বের হতেও ভয় করত। সূর্যাস্তের পর কেউ এই এলাকার কাছে আসতে সাহস করত না। এই এলাকার চতুর্দিকে ছিল একটি বিল। আশে পাশের মাইলের পর মাইল অঞ্চল হতে পানি এসে এই বিলে জমা হতো এবং বর্ষাকালে ইহা পূর্ণ হয়ে যেত। এই বিল শহরটির জন্য একট প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ছিল। শহরটি হতে দূরে চতুর্দিকে ছিল সুশৃংখলরূপে রোপিত বৃহৎ ও সুন্দর ফলের বাগান। সমাজের ধনী দরিদ্র সবাই এ ফল খেত। এই কেন্দ্রের সংরক্ষণের জন্য ইহার চতুর্দিকে যথোপযুক্ত দূরত্বে ছিল প্রতিরক্ষাকারী ঘাঁটি যার ধ্বংসাবশেষ এখনো দেখতে পাওয়া যায়। এ সকল ঘাঁটির মধ্যে বাসা, খারা, টিকরীওয়ালা, রসূল, ওয়াদালা, কান্দিলা ও **দাপী** এখনো বিদ্যমান আছে। সময়ের সাথে সাথে অনেকগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে। এ বিশাল ঘাঁটির প্রতি লক্ষ্য করলে এ শহরটির গুরুত্ব ও ইতিহাসে এর মর্যাদাজনক অবস্থান অনুমান করা যায়।

এ যুগটি ছিল মুসলিম প্রাধান্যের যুগ। এখন আমি অন্য দিকটির বর্ণনা দিব যখন পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়ে গেল। প্রতারণার মাধ্যমে শিখেরা এই এলাকায় প্রবেশ করে এবং কাদিয়ান দখল করে নেয়। কাদিয়ানের পতনের পর জ্ঞান-বিজ্ঞান, শান্তি ও উন্নতিরও পতন ঘটলো। চারিদিকে অশিক্ষা ও গোলযোগ দেখা দিল। কাদিয়ান হয়ে উঠলো সকল মন্দ কাজের কেন্দ্রবিন্দু। এর দরুন ও অন্যান্য ভয়-ভীতিতে অধিবাসীরা শহর থেকে পলায়ন করলো। প্রতিশ্রুত মসীহ্ নিম্নোক্ত ভাষায় পরিস্থিতির বর্ণনা করেনঃ

"ঐ সময়ে আমাদের পূর্বপুরুষদের উপর বড় ধরনের ধ্বংস ও বিপদাবলী পতিত হয়েছিল। তাদেরকে আটক করা হয়েছিল, লুট করা হয়েছিল এবং ইসরাঈলীদের ন্যায় বন্দী করা হয়েছিল। তাদের মসজিদ ও বাড়ীঘর ধ্বংস করা হয়েছিল। সুন্দর বাগানগুলো কেটে দেয়া হয়েছিল। অধিকাংশ মসজিদ শিখদের উপাসনালয় "ধর্মশালা"তে পরিণত করা হয়েছিল। একটি মূল্যবান লাইব্রেরী অসম্মানজনকভাবে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। এতে হাতে লেখা পবিত্র কুরআনের ৫০ কপি ছিল। এতসব কিছু করার পর শিখেরা আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠদেরকে কাদিয়ান ত্যাগ করতে আদেশ দিল। অতএব নারী-পুরুষসহ সকল অধিবাসীকে ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়ে দেয়া হলো। তারা সব বাস্তুহারা হয়ে পাঞ্জাবের বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় গ্রহণ করলো।"

পারস্য বংশোদ্ভূত এই পরিবার অনেক যুগ ধরে এই এলাকা শাসন করেছিল। পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তারা তাদের পদ-মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়ে শূন্য হাতে এলাকা ত্যাগ করলো। তাদের যা কিছু ছিল সবই কেড়ে নেয়া হলো। নূতন শাসকরা এমন সব কর্মকাণ্ড করলো যে, তারা গোটা পরিবেশকে ছারখার করে দিল। তাদের এ ধরনের কর্মকাণ্ডের চিহ্ন। সর্বত্র বিদ্যমান। আপনি যে দিকেই তাকাবেন সে দিকেই দেখতে পাবেন যে, দালান-কোঠাগুলো ধ্বংস প্রাপ্ত এবং গৃহগুলো আলোশূন্য। যে এলাকা ঠিকঠাক আছে সেখানেও দেখা যাবে দুঃখ ও শোকের ছায়া। আমি অনুমান করি শহরের বসতিপূর্ণ এলাকা ছিল ২২ থেকে ২৩ একর। এর চার ভাগের তিন ভাগ ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল। অবশিষ্ট চার ভাগের এক ভাগের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৫০০। এই এলাকায় বাস করতে উৎসাহিত করার জন্য ভূস্বামীরা লোকদিগকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তাসহ বিনাভাড়ায় তাদের বাড়ীঘর দিতে চেয়েছিল। পরবর্তীকালে কোন এক সময়ে অমুসলমানেরা তাদের ধর্মীয় বিদ্বেষের দরুন আহমদীদের নিকট বাড়ীভাড়া দিত না অথবা বাড়ীভাড়ার ব্যাপারটি জটিল করে তুলত। (ক্রমশঃ)

অনুবাদক– নাজির আহমদ ভূঁইয়া

আচ্ছি কাহানীয়াঁ

(ভাল ভাল গল্প)

মূল-বুশরা কুরায়েশী

(দ্বিতীয় কিস্তি)

সাকিবের বন্ধু

স্কুল ছুটি হয়েছে। ঘন্টা বাজছে। ছাত্ররা শ্রেণী কক্ষ থেকে বের হয়ে সদর দরজার দিকে রওয়ানা দিয়েছে। যেসব ছাত্রের ভ্যানগাড়ী এসেছে তারা গাড়ীতে চড়ে রওয়ানা দিয়েছে। যেসব ছাত্র বাসে যায় তারা বাসে বসে ঘরে রওনা দিয়েছে। কতক ছাত্রকে নেবার জন্যে তাদের পিতা-মাতা এসেছেন। সাকিব আর ইকবালের বাড়ী যেহেতু নিকটবর্তী ছিলো তাই তারা পায়ে হেঁটেই বাড়ীর পথে রওয়ানা দিয়েছে। তারা কেবল সহপাঠিই ছিলো না বরং তারা একে অপরের খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধুও ছিলো। এজন্যে পরস্পরের প্রতি খুবই খেয়াল রাখতো।

তাদের বাড়ী যাওয়ার পথে পড়তো একটি মাঠ। সেখানে অধিকাংশ ছেলে-পেলে ক্রিকেট বা হকি খেলতো। এখনও যখন উভয় বন্ধু পাশাপাশি যাচ্ছিলো তখন তারা বালকদের ক্রিকেট খেলতে দেখতে পেলো। বাউন্ডারীর নিকটে একটি খেলোয়ার চিৎকার দিয়ে বল্লো, ওহে! তোমরা দেখো না 'লম্বু' আসছে! সকল বালকই ঘুরে সাকিবকে দেখলো এবং হাসতে লাগলো। সাকিব সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। সে খুবই ভাল বালক। অন্যদেরকে হাসি-ঠাট্টা করতো না। অন্যদের প্রতি ব্যঙ্গও করতো না। কম বয়সেই তাকে খুব লম্বাটে দেখাতো। তার অনেক বন্ধুই তার বিরাট বপুর জন্যে ঠাট্টা করতো; কিন্তু যেহেতু সে ঠান্ডা মেজাযের অধিকারী ছিলো তাই সে মিষ্টি হেসে চুপ থাকতো। ইকবাল তার মিষ্টি হাসিতে চড়ে যেতো, বলতো, "তুমি তাদের শায়েস্তা করছো না কেন, তোমার সামনে ওরা তো পিচ্ছি?" সে বলতো, "কিছু হয় নি বন্ধু, যদি আমি তাদের মত বলতে থাকি তাহলে পরে তাদের মাঝে আর আমার মাঝে পার্থক্যটা থাকলো কী? এসব তো ছোট্ট ছোট্ট কথা, দোস্ত। আমার ইচ্ছা যে, আমি আমার Ideal (আদর্শ) এভাবে দেখালে পরে হাসি-ঠাট্টাকারীরা মুখ বন্ধ করে ঘরে চলে যাবে।" "Ideal কেমন Ideal ? তুমি কি কোন Ideal বানিয়ে নিয়েছো?" ইকবাল বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো। "হ্যাঁ, আমার Ideal একজন বিশ্বজনীন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। স্যার মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব এবং আমার হিরো প্রফেসর আব্দুস সালাম সাহেব। আর আমি মুহাম্মদ বিন কাসিম ও তারিক বিন যিয়াদের ন্যায় সেনাপতিদের পসন্দ করি। এঁরা হলেন সেই সৈনিক যাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা ধর্ম ও পার্থিক জীবনে সফলতা লাভ করবো", সাকিব বল্লো।

"সাবাশ বৎস", পিছন থেকে একজন প্রবীণ লোকের আহ্বান শোনা গেলো। তিনি উভয়ের কথা-বার্তা শুনতে শুনতে আসছিলেন। তিনি সাকিবকে আদর করে পিঠ চাপড়ে দিলেন এবং সামনে এগিয়ে গেলেন। উভয় বন্ধুই মাঠ অতিক্রম করে বাড়ীর দিকে পথ ধরলো। রাস্তায় ইকবাল সাকিবকে বল্লো,

"Ideal, এত বড় তবে ডিশ লাগিয়েছো কেন?"

সাকিব থেমে থেমে জবাব দিলো। "দোস্ত! তোমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে, তবে সত্য ইহাই এবং তুমি তো জানই যে, আমি কখনও মিথ্যে কথা বলি না। হাদীসে এসেছে যে, মিথ্যা বলা পাপ। ইহা মানুষকে দোযখে নিয়ে যায়। তোমরা মনে করো যে, ডিশে কেবল ফিল্মই দেখা যায়। না হে দোস্ত! উহা দ্বারা আমরা এম টি এ-এর প্রোগ্রাম দেখে থাকি।" "এ চ্যানেলে কোন্ ফিল্ম দেখা যায়?" ইকবালের খুবই জানবার আকাঙ্ক্ষা ছিলো। "এতে ফিল্ম দেখা যায় না। এতে তো আমাদের প্রিয় খলীফার খুতবা শুনা যায়। জামাতের বিভিন্ন প্রোগ্রাম দেখা যায়। এর মধ্যে আল্লাহ্‌র প্রশংসা সূচক নযম (কবিতা) ও নাতও [রসূল (সঃ)-এর প্রশংসা] প্রচারিত হয়।

কখনও আমাদের এখানে এসো। তোমাকে দেখাবো আমাদের প্রিয় খলীফা অন্তরে প্রভাব বিস্তারকারী কতই প্রিয় আধ্যাত্মিক কথা-বার্তা বলেন এবং এ প্রোগ্রাম সমগ্র বিশ্বে দেখানো হয়। সবচে' ভাল জিনিষ এই যে, কুরআন পাক শুদ্ধ ও সঠিক উচ্চারণের সাথে সারা বিশ্বের লোকদেরকে শিখানো হয়ে থাকে। যে-ই কুরআন শিখতে চায়, সে এ প্রোগ্রাম থেকে সুন্দরভাবে কুরআন শিখতে পারে। আমাদের প্রিয় খলীফার নির্দেশ এই যে, জামাতের প্রত্যেক ব্যক্তি সে তিফল হোক বা খাদেম, নাসের হোক বা লাজনা ও নাসেরাত হোক সকলে যেন সঠিক উচ্চারণের সাথে কুরআন শিখে এবং অন্যদেরও যেন শিখায়। এভাবে তারা এ কথার ব্যবহারিক ব্যাখ্যায় পরিণত হয়ে যান যে, উত্তম মু'মিন ঐ ব্যক্তি যে স্বয়ং কুরআন শিখে এবং অন্যকেও শিখায়," কথাগুলো গড় গড় করে বল্লো সাকিব। "তোমরা তো হাদীসও শিখেছো", ইকবাল বিস্ময় প্রকাশ করে বল্লো। "এতে আমার কেবল এই বাহাদুরী যে, আমি মুখস্ত করে রাখি। কষ্ট তো করেন আমার আম্মু-আব্বু। আর আমাদের হালকার নাযেম আতফাল সাহেব। এসব লোকেরা একত্রে আমাকে হাদীস ও দোয়াগুলো শিখিয়ে থাকেন। তুমি প্রায়ই দেখতে পাও যে, আমি রাগ করি না। আমাকে এ কথা শৈশবেই বলে দেয়া হয়েছে যে, রাগ করা ঠিক নয়। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে।

ইজতানিবুল গাযাবা- রাগ করা থেকে বাঁচো। ইহা আমাদের নবী (সঃ)-এর আদেশ। কেননা, রাগ ঝগড়া-বিবাদের কারণ ঘটায়। আরও একটি ছোট্ট হাদীস আছে– **ইহফিয লিসানাকা**-তুমি তোমার জিহ্বাকে সংযত করো। এভাবে বল্লো। **আতি' আবাকা** -তোমার পিতার আনুগত্য করো" সাকিব গড় গড়িয়ে হাদীস শুনিয়ে যাচ্ছিলো। আর ইকবাল বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে ছিলো। উভয়েই বাড়ীর নিকটে চলে আসলো। উভয়েই **আল্লাহ্ হাফিয** বল্লো আর নিজ নিজ বাড়ীতে চলে গেলো।

দ্বিতীয় দিন সাকিব নিজের ঘরে বসে 'হোম ওয়ার্ক' (বাড়ীর পড়া) প্রস্তুত করছিলো। এমন সময় ইকবাল ঘরে প্রবেশ করলো। কিন্তু সে বাড়ীর পড়া প্রস্তুত করণে এত নিমগ্ন ছিলো যে, কখন ইকবাল ঘরে আসলো এবং সম্মুখের চেয়ারে বসলো তা সে টেরই পেলো না। মোটকথা গতকাল স্কুল থেকে আসার সময়ে উভয় বন্ধুর মধ্যেই যে কথোপকথন হয়েছিলো তাতে ইকবাল অশেষ প্রভাবান্বিত হয়েছিলো। সবচে' আশ্চর্যবোধ করছিলো সে ঐ কথায় যে, আজকালকার ভিডিও, ভিসি, আর এবং ডিশের যুগে সাকিবরা ফিল্ম দেখে না কেন? অথচ ইকবালের আব্বু-আম্মু তাকে কখনও নিষেধ করে নি। এজন্যে আজ দ্বিতীয়বার সে সাকিবের এখানে এসেছিলো তার সাথে আরও কথোপকথনের মাধ্যমে এ জটিলতার সমাধানের জন্যে। সে এম, টি, এ-এর প্রোগ্রামও দেখতে চাচ্ছিলো। এজন্যেই তো সে সাকিবদের ঘরে এসেছিলো। তার আম্মু বলেছিলেন, সে বাড়ীর পড়া প্রস্তুত করছে। তাই সে এখানেই চলে এসেছে।

লিখতে লিখতে সাকিব হঠাৎ মুখ তুল্লো এবং ইকবালকে সম্মুখে বসা দেখতে পেয়ে, "আরে তুমি কখন এসেছো, দোস্ত! আমার তো "জানাই নেই!"

"হ্যাঁ, মিয়া বইয়ের পোকা। এখন তুমি আমাদের খবর আর কি রাখবে?" ইকবাল কৃত্রিম রাগ মিশানো গলায় বল্লো। "আরে না না এমন কথা নয়। তুমি তো জানো যে, বাড়ীর পড়া এত বেশী দেয়া হয় যে, শেষ হতেই চায় না", সাকিব হাসতে হাসতে বল্লো।

"ঠিক আছে, তুমি বসো, আমি তোমার জন্যে গরম চা নিয়ে আসছি," এ কথা বলে সাকিব পাকের ঘরের দিকে দৌড় দিলো।

এদিকে ইকবাল তো অবসর বসেছিলো। সে এমনিতে সাকিবের পুস্তকাদি ঘাঁটতে আরম্ভ করলো। অধিকাংশই ছিলো পাঠ-সূচীর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং সে যেখানকারটা সেখানেই রেখে দিলো। কিন্তু একখানা পুস্তক সে উঠিয়ে হাতে নিলো। এটা ছিলো কালো মলাটের একখানা ডায়েরী। ইকবাল আনমনাভাবে ওটাকে খুলে ফেল্লু, যদিও সে জানতো যে, অনুমতি ছাড়া কারও ডায়েরী খুলে পড়া খুবই খারাপ কাজ। কিন্তু যেহেতু গভীর বন্ধুত্ব ছিলো তাই কোন দোষের মনে করে নি। প্রথম পৃষ্ঠা খোলার পরই তার দৃষ্টি এমন একটি লেখার ওপরে পড়লো যে, সে পড়তেই থাকলো- অযাচিত অসীমদাতা পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তাআলার নামে এ ডায়েরী আরম্ভ করা হয়েছে এবং মোটা অক্ষরে নিম্নোক্ত পংক্তি লেখা রয়েছে ঃ

হামদ ও সানা উসিকো জো যাতে যাবেদানী
হামসর নেহিঁ হ্যা উসকা কোই না কোই সানী ॥

অর্থঃ প্রশংসা ও স্তুতি সেই সত্তার যা চিরস্থায়ী, তাঁর নেই কোন সঙ্গী আর না কোন দ্বিতীয়।

এর পরে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের হাদীস লেখা ছিলো-কতক এভাবে

"-এমন লোক কখনও দোযখে যেতে পারে না যে আল্লাহ্‌র ভয়ে কাঁদে।"

"দেহ ও পোষাকের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অর্ধেক।"

"ঈমান ধৈর্য ও প্রশস্ত হৃদয়ের নাম।"

"অধিকতর উত্তম ঈমানের লক্ষণ এই যে, তোমার বন্ধুত্ব ও শত্রুতা কেবল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে।"

"সর্বদা সত্য ও ন্যায্য কথা বলো।"

"তোমাদের মধ্যে উত্তম লোক ঐ ব্যক্তি, যে স্বভাব-চরিত্রে উত্তম।"

"তুমি নিজের ভাইয়ের দুঃখ-কষ্টে আনন্দানুভব কোর না, আল্লাহ্ তাকে এ দুঃখ-কষ্ট থেকে রক্ষা করে এতে তোমাকে ক্লিষ্ট করতে পারেন।

"ঐ ব্যক্তি নিকৃষ্ট, যে বৃদ্ধকালে পিতা-মাতাকে পায় অথচ তাদের সেবা করে বেহেশ্‌ত লাভ করতে পারে না।"

"দোয়া কখনো বৃথা যায় না"

"নিজের ভাই-এর সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করার এক প্রকার সদকা"

"মু'মিনের চেহারার মধ্যে প্রফুল্লতা এবং প্রাণ দুঃখ ভারাক্রান্ত থাকে।"

পরে বড় বড় অক্ষরে কবিতার পংক্তি লেখা আছে ঃ

মুহাম্মদ পর হামারী জাঁ ফিদা হ্যায়
কে উত্তহ্ কুয়ে সনম কা রাহনুমাঁ হ্যা।

অর্থাৎ মুহাম্মদ (সঃ)-এর পরে প্রাণ মোদের বিলীন,
কেননা, তিনি যে মম প্রিয়ের পথের দিশারী। পরবর্তী পৃষ্ঠা উল্টালে দেখা গেলো যে, গোটা পৃষ্ঠা কবিতার পংক্তিতে ভরপুর। প্রথম পংক্তিটিই মনটা কেড়ে নিয়ে গিয়েছিলো। লেখা ছিলোঃ

"মাহমুদ ! মম জীবন যদি এভাবেই হায় কেটে যায় যাক,
(তবু) মম আত্মা যেন থাকে সিজদাতে আর সম্মুখে থাকেন খোদা
শত্রুদেরও অকল্যাণও না চাই কভু,
সদা মঙ্গলই দেখি যেন চোখে।
বেচারা মানুষ কি করে পুরো করবে তোমার প্রয়োজনসমূহ,
গোটা প্রয়োজন লাগি মিনতি করগো প্রয়োজন পূরণকারীর সকাশে।"

ইকবাল পংক্তিগুলো পড়ে যাচ্ছিলো আর এক আশ্চর্য বিমোহিত অবস্থা তাকে ছেয়ে ফেল্লো। এত ভাল ভাল পংক্তি না জানি কার, সে মনে-মনে চিন্তা করলো।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় লেখা ছিলো-শনিবার দিন আম্মু নামাযের জন্যে জাগিয়েছেন। মসজিদে গিয়ে নামায পড়েছি। কুরআনের ক্লাসে অংশ নিয়েছি। বন্ধুদের সাথে ক্রিকেট খেলেছি। পরে বাড়ী ফিরে এসেছি। স্কুলের সময় হয়ে যাচ্ছিলো তাই শীঘ্র শীঘ্র নাস্তা খেলাম। প্রস্তুত হয়ে আম্মুকে **'খোদা হাফিয'** বল্লাম। আম্মু সাধারণতঃ আমার কপালে আঙ্গুল দ্বারা দোয়া লিখেন-*ইয়া হাফিযু* (হে সংরক্ষণ কারী!) ইয়া আযীযু (হে মহা পরাক্রমশালী!) *ইয়া রফীকু* (হে পরম বন্ধু!)।

আমি স্কুলের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলাম। স্কুলে পৌছতে কিছুটা বিলম্ব হয়ে গেলো। কেননা, ঘর থেকে বের হয়েছি অমনি পাড়ার এক বর্ষীয়ান মহিলা বল্লেন, বাবা! ডিম ও দুধ এনে দাও না। আমি না করতে পারলাম না। স্কুলে পৌছুতে কিছু দেরী হয়ে গেলো। এখন আমি সকলকে এর কি কারণ বলবো! দেড়টায় ছুটি হলো। বাড়ী চলে আসি।

গোসল সেরে খাবার খেলাম। আজ আম্মু আমার পসন্দমত খাবার তৈরী করেছেন। এজন্যে খুউব করে খেলাম। খাবার পরে ঘরেই যুহরের নামায পড়লাম। কিছু সময় বিশ্রাম করলাম। ৪ টার সময়ে আম্মু জাগিয়ে দিলেন।

মুখ হাত ধুয়ে এসে আমার প্রিয় পাক্ষিক আহমদী ও আহ্বান দেখতে থাকলাম। তাড়াতাড়ি পড়া শুরু করে দিলাম। হাদীসে রসূল (সঃ) অমৃতবাণী, হুযূর (আইঃ)-এর খুতবা, ছোটদের পাতা, মুক্তো ঝরার পাতা প্রভৃতি পাঠ করলাম। এর পরে এম টি এ-এর প্রোগ্রাম দেখলাম। 'আসরের নামায মসজিদে গিয়ে পড়লাম। ফিরে এসে টি ভিতে শিশুদের কারটুন প্রোগ্রাম ও বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রোগ্রাম দেখলাম। এর মধ্যে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো। এর পর খুকীকে ইংরেজী পড়ালাম। সাথে সাথে নিজের বাড়ীর পড়াও প্রস্তুত করতে থাকলাম। মাগরিবের নামায মসজিদে গিয়ে পড়লাম। নামাযের পড়ে কুরআন ক্লাস হলো। এতে ক্বারী সাহেব সঠিক উচ্চারণের সাথে কুরআন শিখালেন। ফিরে এসে রাতের খাবার খেলাম। 'ইশার নামায পড়লাম এবং বিছানায় শুতে গেলাম।

'বেশ করেছে, ডাইরী লিখেছে"-ইকবাল বন্ধ করতে করতে বল্লো। "বন্ধু, কিছু দেরী হয়ে গেলো। আম্মু কোন এক বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজে এক স্থানে পাঠিয়েছিলেন। সাকিব চায়ের ট্রে নিয়ে আসতে আসতে বল্লো। তোমার কোন প্রকার কষ্ট তো হয় নি"। "না ভাই কোন কষ্ট হয় নি, বরং তোমার কাছে আমি লজ্জিত যে, তোমার ডায়েরী বিনা অনুমতিতে পাঠ করেছি," ইকবাল উত্তরে বল্লো।

"কোন অসুবিধা নেই। নিত্য দিনের কর্ম-কান্ড লিখে রাখি এই আর কি।"

উপরোক্ত কথা-বার্তা ব্যতিরেকে কবিতার পংক্তিগলো মনে বড়ই

দাগ কেটে ছিলো বিশেষ করে ঐ পংক্তিটি যা আমাকে অধিক প্রভাবিত করে ছেড়েছে। সে ডায়েরী খুল্লো আর সুর করে পড়লো-
খোদা শাহেদ হ্যা উসকি রাহ মেঁ মরনে কি খাওয়াহেশ হ্যাঁ,
মেরা হার যাররা তান ঝুক রাহা হ্যা ইলতিজা হো কার"।
খোদা সাক্ষী, তাঁর পথে মরণ লাগি সদা আকাঙ্ক্ষা মোর,
দেহের প্রতি অণু মম হচ্ছে বিনত হয়ে কাতর"।
"এ পংক্তি আমাদের জামাতের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেব (রাঃ) লিখেছেন", সাকিব বল্লো।
"এত সব কবিতা তোমরা কীভাবে মুখস্ত রাখো", ইকবাল বল্লো।
"আমাদের কবিতা প্রতিযোগিতা হতে থাকে এজন্যে আমাদের কবিতা মুখস্ত থাকে", সাকিব উত্তর দিলো।
ইকবাল চিন্তা করতে লাগলো যে, আমার বয়সেরই ছেলে আমার ক্লাসের ছাত্র অথচ আমাদের চেয়ে কত ভিন্ন ধরনের"
সাকিব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আরবী কসীদার (কবিতা) কয়েকটি পংক্তি সুর করে শুনানোর পরে বল্লো "এ আরবী পংক্তি কয়টি হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর। তিনি আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করে এগুলো লিখেছেন। তুমি তো জানো যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ওপরে দুরূদ পাঠনো খুবই পুণ্যের কাজ। হুযূর (সঃ) স্বয়ং বলেছেন,
"যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দুরূদ পাঠায় আল্লাহ্তাআলা তাঁর প্রতি দশটি রহমত (অনুগ্রহ) অবতীর্ণ করেন"।
এসব কথা-বার্তা হচ্ছিলো। এর মধ্যে 'আসরের আযান পড়লো। সাকিব উঠতে উঠতে বল্লো, "এখন তুমিও নামায পড়তে যাও, আমিও যাচ্ছি " (চলবে)

অনুবাদ- **মোহাম্মদ মুতিউর রহমান**

উটেচড়া নবী চাঁদেচড়া মানুষ

(২০ পৃষ্ঠার পর)

যেতো। কখন কখন মক্কার কুরায়েশ নেতারা উপস্থিত হয়ে আঁ হযরত (সঃ)-এর বিরুদ্ধে জঘন্য অপপ্রচার দ্বারা লোকজনেক সরিয়ে রাখতো। এসব সত্ত্বেও তিনি কখনও বিচলিত বা নিরাশ হতেন না। তিনি আল্লাহ্র দেয়া দায়িত্ব পালনে কখনও বিরত হতেন না।
তাঁর ঐকান্তিক প্রচারে কারো কারো মনোজগতে শুভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতো। তা'ছাড়া তখনও এমন কিছু লোক ছিলো যারা মূর্তি পূজার ভক্ত ছিল না। তারা সামাজিক জীবনে প্রচলিত অনেক আচার-অনুষ্ঠানও পসন্দ করতো না। ফিগফারী গোত্রের হযরত আবূজর দাওস গোত্রের তোফায়েল ইবনে আমর ও আরো কয়েক জনের ইসলাম গ্রহণ এর সত্যতার প্রমাণ বহন ও আশার আলোরও উদ্রেক করে। অমানিশা যত গাঢ় অন্ধকার নিয়েই আসুক না কেন এরও শেষ আছে। নবুওয়তের দশম বৎসরে (তায়েফ হতে ফিরার পর] রজব মাসে মদীনা হতে খাযরাজ গোত্রের ছয় জন [কোন কোন মতে আট জন] গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেন। এর তিন বছরের মধ্যেই মদীনা ইসলাম প্রচারের প্রাণ কেন্দ্রে পরিণত হয়।
মদীনার নাম ছিল ইয়াসরিব (রোগের গাঁ) মহানবী (সঃ)-এর হিজরতের পর এর নামকরণ হয় 'মদীনাতুন্নবী' নবীর শহর সংক্ষেপে মদীনা। রোম থেকে বিতারিত ইহুদীরা এ অঞ্চলে বসবাস করতো। এরা ছিলো ব্যবসায়ী ও সুদ কারবারী। নিজেদের নিরাপত্তার জন্য মদীনার উত্তর অঞ্চলে (প্রায় সিরিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গ তৈরি করে ওসবে বাস করতো। এরা ছিলো খুবই প্রভাব প্রতাপশালী। তাদের কিতাব হলো তওরাত। যাজক ও পুরোহিতেরা এ কিতাবে প্রচুর বিকৃতি ঘটায়। তাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনেও এর প্রতিফলন ঘটে। তাদের মাঝে তৎকালীন শিক্ষা প্রচলনের জন্য বহু মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। অবক্ষয়ে যত জর্জরিত হোক না কেন তাদের এমন কিছু লোক ছিলো যারা বিশ্বাস করতো যে, তওরাত পন্থীদের মধ্য হতেই ভবিষ্যতে একজন নবীর আবির্ভাব ঘটবে।
আরবের কোন কোন গোত্রের কিছু লোক ঐ অঞ্চলে বাস করতো। ইয়ামেনের বড় প্লাবনের পর কাহতান বংশের একটি গোত্র স্বদেশ ত্যাগ করে ইয়াসরেবে বসবাস করতো। 'আওস' ও 'খাযরায' দু'ভাই এই গোত্রেরই। তারা আনসার নামে পরিচিত ছিলো। এখানকার আনসারদের গোত্রসমূহ এই দুই ভাইয়েরই বংশধর। কালক্রমে এদের প্রভাব বেড়ে যায়। শান্তিতে বসবাসের জন্য ইহুদীরা এদের সাথে সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়। যতদিন আওস ও খাযরায গোত্রদ্বয়ের মাঝে ঐক্য ছিলো ততদিন ইহুদীরা সন্ধিশর্ত মেনে চলছিল। যখন ঐ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে কেন্দল দেখা দিল এবং ক্রমে তা ভয়াবহ যুদ্ধে পরিণত হলো তখন আনসাররা খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে। ঐ অবস্থায় তাদের উপর ইহুদীদের প্রভাব প্রতিপত্তি প্রবল হয়ে ওঠে। ক্রমে আনসাররা কুসংস্কার, অশিক্ষা-কুশিক্ষায় নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। তা সত্ত্বেও ইহুদীদের সংস্পর্শে থাকায় তাদের মাঝে নবুওয়ত, ঐশী গ্রন্থ ও একেশ্বরবাদের ধারণা বিরাজিত ছিলো। এ অবস্থায় আনসারদের নিকট ইসলামের বাণী পৌছায়। আকাবায় ছয় বা আট জনের গোপনে বয়াতের কথা বলা হয়েছে। তারা ফিরে গিয়ে পরিবার-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবদের মাঝে নতুন ধর্ম তথা ইসলামের প্রচার করতে থাকেন।
নবুওয়তের একাদশ বৎসরে হজ্জের সময়ে পুনরায় বারজন মদীনাবাসী আকাবায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁদের অনুরোধে ধর্মীয় ও নৈতিকতা সম্পর্কে শিক্ষা দানের জন্য আঁ হযরত (সঃ) মুসআব বিন ওমাইরকে তাঁদের সাথে মদীনায় পাঠান। তিনি খুব বিলাসবহুল জীবন যাপন করতেন। ইসলাম গ্রহণের পর সর্বস্ব ত্যাগ করেন। মদীনাতে তিনি বাড়ী বাড়ী গিয়ে ইসলামের দাওয়াত পৌছাতে থাকেন যতটুকু কুরআন নাযিল হয়েছিলো তা শুনাতেন। তাতে মদীনা ও এর আশেপাশে মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। ইনিই ইসলামের প্রথম মুবাল্লিগ সাদ ইবনে মাআয ছিলেন আওস গোত্রের প্রবীণ দলপতি। তার পরই স্থান ছিলো আসওয়াদের। এই দুই সর্দার হযরত মুসআবকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। উভয়েই হযরত মুসআবের সাথে আলোচনা করে ও কুরআনের আয়াত শুনে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত উমর (রাঃ)-এর মত তাঁরাও 'মারতে' এসে ইসলামের জন্য মরতে রাজি-এর অবস্থা সৃষ্টি করলেন। পর বৎসর নবুওয়তের দ্বাদশ বর্ষে মদীনার প্রায় পাঁচ শত জন মক্কায় আসে। তাদের মধ্যেকার তিরাত্তর জন পুরুষ ও দুইজন মহিলা ছিলেন মুসলমান। তাঁদের খায়েশ ছিলো যে, তাঁরা আঁ হযরত (সঃ)-কে মদীনায় আসতে অনুরোধ জানাবেন। এজন্য তাঁদের সর্দারগণও এসেছিলেন। তাঁরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে গোপনে আকাবায় উপস্থিত হন। রসূল করীম (সঃ)-হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে সাথে নিয়ে তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। (চলবে)

-**মোহাম্মদ মোস্তফা আলী**

চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র ২৮ তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

❑ গত ১৪ই এপ্রিল, ১৯৯৯ ইং তারিখ রোজ বুধবার চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র ২৮তম বার্ষিক ইজতেমা আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন মোহতারম মোবাশ্বেরুর রহমান, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চট্টগ্রাম। নামায কায়েম করা ও ঐশী জামাতের জন্য লাজনাদের করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে বক্তৃতা দান করি খাকসার এবং খতমে নবুওয়ত সম্পর্কে বক্তৃতা দেন জনাব সাদেকা হক সাহেবা, নায়েব সদর, বাংলাদেশ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌। জনাব ইশরাত জাহান, প্রেসিডেন্ট, চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহ, নসিহতমূলক বক্তৃতা দান করেন। ইজতেমায় লাজনা ও নাসেরাতসহ মোট ১৪০ সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

মাকসুদা রহমান
সদর ,বাংঃ লাঃ ইমাইল্লাহ্‌

ঢাকা লাজনা ইমাইল্লাহ্‌'র তালীমী কোর্স

❑ আল্লাহ্‌তাআলার অশেষ ফযলে গত ১২ ও ১৩ই এপ্রিল '৯৯ইং লাজনা ও নাসেরাতগণের তালীমী কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। মোহতারমা মাহমুদা আখতার দোয়ার মাধ্যমে কোর্সের উদ্বোধন করেন। কোর্সে অংশগ্রহণকারী লাজনা ও নাসেরাত বোনেরা নিজ নিজ সিলেবাস ভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেন। প্রশ্ন-উত্তর, গঠনমূলক ও সময়োপযোগী নসিহত, উর্দু পড়া ও লেখা অনুশীলন ইত্যাদি বিষয় কোর্সের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অংশগ্রহণকারী ২০ জন উপস্থিত ছিল।

জিনাত সুলতানা
সেক্রেটারী তালীম, লাঃ ইমাইল্লাহ, ঢাকা

তালীম-তরবীয়তী ক্লাস

❑ আল্লাহ্‌তাআলার অশেষ ফযলে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বি-বাড়িয়া জেলা মজলিসের উদ্যোগে তারুয়া সেন্টারে ১৯-২৩ শে মার্চ ৫ (পাঁচ) দিনের তালীম তরবীয়তী ক্লাস সফলতার সহিত সম্পন্ন হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

উক্ত ক্লাসে স্থানীয় মজলিস হতে মোট ১১৭ উপস্থিত হয় *(আতফালঃ ৮৯, খোদ্দাম ঃ ২৩, আনসারঃ ৫)*। *মুকবুল আহমদ, জেলা কায়েদ*
জেলা মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

তালীম তরবীয়তী ক্লাস

আল্লাতাআলার অশেষ কৃপায় আহমদীয়া মুসলিম জামাত কুমিল্লার উদ্যোগে আহমদীয়া মসজিদে ৩দিন ব্যাপী তালীম তরবয়তী ক্লাস গত ৯/৪/৯৯ হইতে ১১/৪/৯৯ ইং পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্লাসে ২৭জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ ইদ্রিস, প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কুমিল্লা

কায়েদ সম্মেলন ৯৯ইং

গত ২০/৩/৯৯ ইং জনাব এস, এম ইব্রাহীম, নাযেম তালীম এর সভাপতিত্বে বৃহঃ সিলেট জেলা মজলিসের উদ্যোগে কায়েদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় চন্ডিছড়াস্থ জেলা কার্যালয়ে। প্রধান অতিথি হিসেবে মোহতামীম তবলীগ জনাব আবুল হোসেন ভূঞা উপস্থিত ছিলেন।

মোঃ আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, জেলা কায়েদ সিলেট

৫টি নতুন সার কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত

❑ ২৩ মার্চ '৯৯।। পর্যাপ্ত গ্যাস প্রাপ্তির কারণে সরকার দেশে আরও ৫টি নতুন ইউরিয়া সার কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছে। নির্বাচিত স্থানগুলো হলো, ভোলা, সিলেট, বৃহত্তর কুমিল্লা, খুলনা ও যশোরের মাঝামাঝি এবং উত্তর বঙ্গ। গতকাল বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী তোফায়েল আহমদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সরকার ১৩ হাজার ৫শ' কমিউনিটি হেল্‌থ ক্লিনিক নির্মাণ করবে

❑ ২৪ মার্চ '৯৯।। দরিদ্র মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌছানোর লক্ষে সরকার ১৩ হাজার ৫শ' কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিক নির্মাণ করবে। ২০০০ সালের মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে প্রতি ৬ হাজার মানুষের জন্যে একটি করে মেডিকেয়ার সেন্টার নির্মাণ করা হবে। প্রধানমন্ত্রী সোনার গাঁও হোটেলে বেগম ফজিলাতুন্নেছা আই কেয়ার প্রজেক্ট, বাংলাদেশের উদ্বোধনী বক্তব্যে এ ঘোষণা দেন।

২০৫০ সালে বিশ্বের জনসংখ্যা ৯০০ কোটি হচ্ছে

❑ ২৪ মার্চ '৯৯।। জাতিসংঘের সবশেষ হিসাব মতে গত সোমবার বলা হয়েছে যে, বিশ্বের জনসংখ্যা আগামী অক্টোবর মাসে ৬শ'কোটি এবং ২০৫০ সালের মধ্যে প্রায় ৯০০ কোটি হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

যুদ্ধপরাধী গোলাম আযমের ফাঁসির দাবী

❑২৭ মার্চ '৯৯।। গণ আদালতের সপ্তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও '৭১-এর ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি' '৭৩ সালের আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধী আইনে জামাতে ইসলামীর আমীর গোলাম আযমের ফাঁসির রায় কার্যকর করার দাবী জানিয়েছে সরকারের প্রতি।

সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শুরু হচ্ছে

❑২ এপ্রিল '৯৯।। প্রকল্প গ্রহণের দীর্ঘ ৭ বছর পর আগামীকাল সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শুরু হচ্ছে। দু'ধাপে এ প্রকল্পের কাজ শেষ হলে দৈনিক আরো ৪৫ কোটি লিটার পানি বেশী সরবরাহ করা সম্ভব হবে। বর্তমানে পানির চাহিদা দৈনিক ১৪০ কোটি লিটার সরবরাহ করা গয় ৯৫ কোটি লিটার।

৬ এপ্রিল থেকে ঢাকা-কলকাতা বাস সার্ভিস

❑ ২ এপ্রিল'৯৯ ।। আগামী মঙ্গলবার ৬ এপ্রিল থেকে পরীক্ষামূলকভাবে ঢাকা ও কলকাতা সরাসরি বাস সার্ভিস উদ্বোধন হচ্ছে। ওই দিন বাংলাদেশ সরকারের একটি প্রতিনিধিদল বিআটিসি বাসে চড়ে ৩ দিনের সফরে কলকাতা যাবেন। ১৫ এপ্রিলের মধ্যে সার্ভিস চালুর জন্যে বাংলাদেশ পক্ষ থেকে চিন্তা-ভাবনা করছে। দ্বিপক্ষীয় আলোচনা ফলপ্রসূ হলে স্থায়ী চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে।

শেখ হাসিনা ও জর্জ মিশেলের ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার লাভ

❑ ২ এপ্রিল '৯৯।। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক মার্কিন সিনেটর জর্জ মিশেল ইউনেস্কোর ১৯৯৮ সালের হফেট বয়েগণি শান্তি পুরস্কার লাভ করেছেন।

বাংলাদেশ ও আয়ারল্যান্ডে বিরোধ অবসানে অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ এই পুরস্কারের জন্য নির্বাচন করা হয়।

সোনালী ব্যাঙ্ক শিল্প উন্নয়ন বন্ড ছাড়বে

❑ ১২ এপ্রিল।। সোনালী ব্যাঙ্ক মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশীদের নিকট ১০ কোটি ডলারের শিল্প উন্নয়ন বন্ড ছাড়ছে। সোনালী ব্যাঙ্কের পরিচালনা পরিষদ মঙ্গলবার এ বন্ড ছাড়ার অনুমোদন দিয়েছে।

সায়েদাবাদ টার্মিনাল কাঁচপুরে স্থানান্তরিত হবে

❑ নগরীর জানজট নিরসন, নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করাসহ পরিচ্ছন্ন নগর জীবন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে নগর পুলিশ কমিশানার এ কে এম শামসুদ্দীনের নেতৃত্বে।

পর্যাক্রমে সায়েদাবাদ বাস টার্মিনালকে কাঁচপুরে আর ফুলবাড়িয়া ও বঙ্গবন্ধু এভিনিউ সংলগ্ন নগর পরিবহন বাস টার্মিনাল সায়েদাবাদে সড়িয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

সংকলন- সরকার মুহাম্মদ মুরাদুজ্জামান

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD

CONCORD CENTRE 43,NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212

TEL : 884724, 872220, 884076,Email-mhk@bdmail.net FAX: 880-2-883552

STAR

"WE EXPORT FROM HONG KONG, CHINA, KOREA, TAIWAN, THAILAND, SINGAPORE, JAPAN & U.K."

FABRICS & ACCESSORIES, JEANSPANT, T-SHIRT, JACKET, SCURT-TOPS, TIDES, SOCKS, SHOES, BLANKET, ELECTRONIC PRODUCTS, COMPUTER ACCESSORIES, TOYS ETC

CONTACT : **MD. SERAJUL ISLAM**

PACIFIC FASHION ENTERPRISE

FLAT-D3, 14/F, CHUNG KING MANSION

36-44 NATHAN ROAD, TST, KOWLOON, HONG KONG

TEL: 852-27214021 FAX: 852-23121073

AHMED TRADE INTERNATIONAL

Manufacturer : Drawstring, Tipping, Stopper, Cotton Twill Tape etc.

Dyer : we have a power dyeing house of our own.

with 100% Challanging guarantee of matching and colour fastness.

Office : 79, Hoseni Dalan Road Dhaka-1211	**Phone :** Off : 239013 Res : 804944
Factory 36/D, Kakrail (1st Floor), Dhaka-1000	**Mobile 017527771** Fax : 880-2-805350

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRDUCER OF QALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.

120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217

Phone : 414550, 9331306

New Vol. No. 61 ● 20th Issue April 30, 1999 Tk. 10.00

Fortnightly **The AHMADI** রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

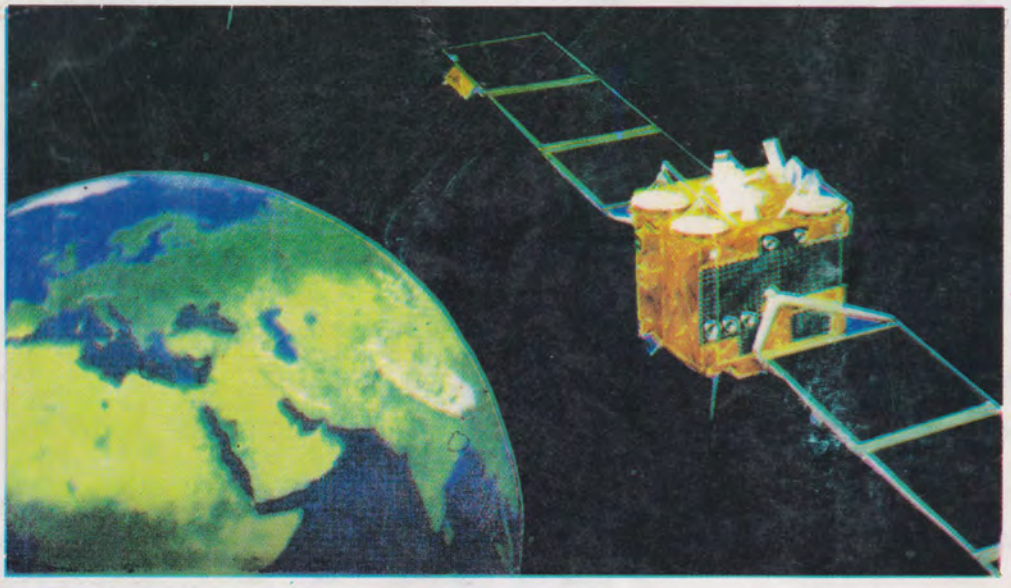

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

Muslim MTA AHMADIYYA INTERNATIONAL

MTA AUDIO CHANNELS

* Main	: 6.50 MHz	* French	: 7.56 MHz
* English	: 7.02 MHz	* German	: 7.74 MHz
* Arabic	: 7.20 MHz	* Indonesian	: 7.92 MHz
* Bangla	: 7.38 MHz	* Turkee	: 8.10 MHz

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪ বক্‌শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

MTA-এর নতুন কর্মসূচী

- প্রত্যহ তিনবার লেকামাআল আরব
- প্রত্যেক মঙ্গল ও বুধবার কুরআন ক্লাস
- প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার হোমিওপ্যাথি ক্লাস
- প্রত্যেক বুধবার বাংলা সার্ভিসে পুরাতন খুতবা প্রচার
- প্রত্যেক বৃহস্পতিবার বাংলা সার্ভিসে প্রশ্ন-উত্তর অধিবেশনের বঙ্গানুবাদ
- এমটিএ-এর দর্শক-শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ প্রোগ্রামগুলো দেখতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।
- প্রতি শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭ টায় হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ)-এর খুৎবাহ শুনুন।

এমটিএ MTA : ৫৭° ইষ্ট, ভিডিও ফ্রিকোয়েন্সী ৯৭৫, মূল অডিও ৬.৫০ মেগাহার্টস্। বাংলা অডিও ৭.৩৮ মে: হা:।

আপনার বাড়ীতে এমটিএ MTA -এর সংযোগ নিন। নিজেকে ও পরিবারকে অবক্ষয়মুক্ত রাখুন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দূরালাপনী ঃ ৯৬৬২৭০৩, ৫০৫২৭২
সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান
Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 9662703, 505272